ডঃ অতুল সুর

সে আর এক কলকাতা

সে আর এক কলকাতা ❑ ডঃ অতুল সুর

সা

সে আর এক কলকাতা

লেখক পরিচিতি

ডঃ অতুল সুর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ নম্বর পেয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। Cum laude সম্মান-সহ অর্থনীতিতে ডি. এস-সি উপাধি পেয়েছেন। ক্রিটিকস্ সারকেল অভ্ ইন্ডিয়া থেকে CCI Award পেয়েছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে 'সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন। 'মধুসূদন' ও 'রামমোহন' পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক 'রবীন্দ্রপুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র অধ্যাপনা করেছেন। ৩৪ বৎসর কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ৪১ বৎসর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-সংস্থায় বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন।

ওঁর ইতিহাসচর্চা সম্বন্ধে ডঃ কালিদাস নাগ বলেছেন: 'বাঙলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তোমার পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ।' ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'আমাদের সমপর্যায়ের লোক হয়েও আপনার পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, নীরবে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি উদ্ঘাটিত করে চলেছেন আপনার কর্মের দ্বারা।'

শান্তিনিকেতনের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: 'আমার অনেক গুরু, তাঁদের মধ্যে আপনার স্থান সকলের শীর্ষে।

ওঁর কলকাতা সম্পর্কিত বই সম্বন্ধে 'আজকাল' পত্রিকায় পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন: 'অতুলবাবু তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত। স্মৃতির সিন্দুকটা বেশ শক্ত-সমর্থ আর বড়-সড় বলেই, এ বইটা তিনি লিখে গেছেন অনায়াস ভঙ্গীতে, পড়তে পড়তে মনে হবে যেন পড়ছি না, শুনছি। লেখাগুলোর গায়ে লেখকের স্মৃতি সোনার গয়নায় জড়োয়ার কাজের মত।'

লেখক ইংরেজি ও বাংলায় আজ পর্যন্ত ১৫৫ খানা বই লিখেছেন। দশ হাজারেরও ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন। বিমল মিত্রের একখানা উপন্যাস ইংরেজিতে তর্জমা করেছেন। নিজেও একখানা উপন্যাস লিখেছেন—যেখানা চলচ্চিত্রে রূপায়ণের সুপারিশ পেয়েছে।

সে আর এক কলকাতা

ডঃ অতুল সুর

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক ল কা তা ৬

অনুজপ্রতিম সুহৃদ
পূর্ণেন্দু পত্রী
স্মরণে

নিবেদন

যদিও 'সে আর এক কলকাতা' বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, তাহলেও জন্মকালে এখানা বই হিসেবে পরিকল্পিত হয়নি। এটা লেখা হয়েছিল 'বর্তমান' পত্রিকার ১৪০৩ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিতব্য এক বিশেষ নিবন্ধ হিসেবে। নিবন্ধটি পড়ে বহু পাঠক আনন্দ পেয়েছিলেন এবং পুস্তকাকারে পরিবেশন করলে খুশি হবেন জানিয়েছিলেন। পাঠকদের সেই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই জন্ম নিয়েছে এই বইখানা। পুনর্মুদ্রণের জন্য আমি 'বর্তমান'-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯২১ সাল থেকে কলকাতাসম্বন্ধে অনুশীলন করে আসছি। সেই অনুশীলনের ফসল আমার কলকাতাসম্বন্ধে তিনখানা বই। বইগুলির একাধিক সংস্করণ হয়েছে। বর্তমানে সেগুলি আর পাওয়া যায় না।

কলকাতা নিয়ে ভাবনা আমার অতি প্রিয় বিষয়বস্তু। কেননা এই কলকাতা শহরেই আমি জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, বিয়ে করেছি, এটাই আমার জীবনের কর্মক্ষেত্র এবং এখানেই দেহ রাখবো। চার প্রজন্ম ধরে কলকাতায় এমন অনেক কিছু দেখেছি যা বর্তমান প্রজন্মের লোকের কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

যে নিবন্ধটি এখন বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে, সে নিবন্ধটি বৈঠকী ঢঙে লেখা। এতে কলকাতাসম্বন্ধে এমন অনেক কথা ও কাহিনী আছে যা পূর্বে আমার অন্য কোনো বইয়ে প্রকাশিত হয়নি। আশাকরি সেগুলি পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করবে।

অতুল সুর

প্রবন্ধসূচী

সে আর এক কলকাতা

এই শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকের কথা। আমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে পুরানো আমলের এক পরিচারিকা ছিল। সেযুগের রীতি অনুযায়ী আমরা ছেলের দল তাকে 'মাসী' বলে ডাকতাম। বয়স্করা বলত 'নসিবপুরী'। এই অদ্ভুত নামটার কারণ, হুগলি জেলার নসিবপুর গ্রাম থেকে সে আমাদের বাড়ি কাজ করতে এসেছিল। বাপমায়ের দেওয়া তার আসল নাম ছিল 'প্রসন্নময়ী'। আমার বাবাই শুধু তাকে 'প্রসন্ন' বলে ডাকতেন।

আমার বাবা ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এক রোগীকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় করার দরুন, লোকটা একদিন দু'টো 'ওভার-সাইজ' তরমুজ নিয়ে হাজির। কৃতজ্ঞতার স্মারকস্বরূপ তরমুজ দু'টো বাবাকে উপহার দিয়ে গেল। তখন সবে দু'মাস হল আমার মেজ বোনের বিয়ে হয়েছে। নতুন কুটুম্বদের তোয়াজ করবার জন্য বাবা একটা তরমুজ আমার মেজ বোনের শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললেন। মা নসিবপুরীকে ডেকে বললেন, 'হ্যালা, মেজ মেয়ের বিয়ের সময় তো কদিন তুই ওদের বাড়ি কাটিয়ে এলি, বাড়িটা তো তোর চেনা হয়ে গেছে, তুই তরমুজটা মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসতে পারবি? 'খুব পারব', বলে নসিবপুরী তরমুজটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বাগবাজারে গিয়ে ও পথঘাট সব গুলিয়ে ফেলল। সামনে যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, তোমরা আমাকে আমার মেজমার শ্বশুরবাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারো? আমি পথ গুলিয়ে ফেলেছি। লোকে মুখ টিপে একটু হেসে নিজ নিজ কাজে চলে যায়।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক নসিবপুরীর কথা শুনছিলেন। এগিয়ে এসে তিনি নসিবপুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বাছা কাদের বাড়ি যাবে?' নসিবপুরী বলল, 'আমার মেজমার শ্বশুরবাড়ি।' বুড়ো ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মেজমার শ্বশুরের নাম কী?' নসিবপুরী বলল, 'তা তো বাপু জানি না, শুধু জানি মুখুজ্যেপাড়ায় আমার মেজমার শ্বশুরবাড়ি।' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ পাড়ায় কাদের বাড়ি কাজ করো?' নসিবপুরী বলল, 'শ্যামবাজারে অমুক ডাক্তারের বাড়ি।' তখন ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝেছি, তুমি আমার সঙ্গে এসো।' ভদ্রলোক নসিবপুরীকে মুখুজ্যেপাড়ায় আমার মেজ বোনের শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিলেন।

এটা সে যুগের কলকাতায়-ই সম্ভব ছিল। এক পাড়ার লোক পাশের পাড়ার লোককে চিনত। তাছাড়া, সে যুগে লোক রাস্তার নামের তোয়াক্কা রাখত না। পাড়ার নামেই কলকাতার অঞ্চলসমূহ পরিচিত ছিল। অজস্র পাড়ায় কলকাতা বিভক্ত ছিল—বড়পাড়া, ছোটপাড়া, আবার পাড়ার ভেতর পাড়া। উত্তর থেকে দক্ষিণে সে যুগের কতকগুলো পাড়ার নাম করছি—বাগবাজার, শ্যামবাজার, মুখুজ্যেপাড়া, নিকারিপাড়া, বোসপাড়া, নেবুবাগান, কাঁটাপুকুর, রাজবল্লভপাড়া, কুমোরটুলি,

মদনমোহনতলা, কমবুলেটোলা, শোভাবাজার, হাতিবাগান, হাটখোলা, বটতলা, গড়ানহাটা, হোগলকুড়ে, দর্জিপাড়া, সোনাগাছি, রামবাগান, নিমতলা, আহিরিটোলা, সিমলা, জোড়াসাঁকো, নন্দনবাগান, গৌড়িবেড়, হালশিবাগান, গোয়াবাগান, বাদুরবাগান, সান্‌কিভাঙা, পটলডাঙা, শুঁড়া, ইনটালি, নেবুতলা, আরপুলি, বউবাজার, মলংগা, জেলেপাড়া, চিনেবাজার, মুরগিহাটা, শাঁখারিটোলা, ধর্মতলা, ডিঙ্গিভাঙ্গা, কসাইটোলা, তালতলা ইত্যাদি। প্রত্যেক পাড়ারই একটা করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল। সব পাড়ার কথা বলা সম্ভব হবে না। মাত্র কয়েকটা পাড়ার কথাই আমি এখানে বলব।

প্রথমেই ধরুন বাগবাজারের কয়েকটা পাড়া। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ হচ্ছে কুমোরটুলি। ওখানেই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডেপুটি ট্রেডার বনমালী সরকারের বাড়ি। বাড়িখানা সেকালের কলকাতার এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। ওই বাড়ির সামনে দিয়েই প্রতিদিন সকালে পদব্রজে যেতেন স্বয়ং মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব, বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে। স্নান সেরে ফেরবার পথে ওই বাড়িতে একবার ঢুঁ মারতেন। বনমালী সরকারের বাড়ির কাছে ওই কুমোরটুলি পল্লীতেই ছিল কলকাতার সহকারী কালেক্টর গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ি, যাঁর নির্মিত নবরত্ন মন্দিরটা সেকালের বিদেশী নাবিকদের কাছে কলকাতার এক দিকচিহ্ন ছিল। মন্দিরটা এখনকার শহিদ মিনারের চেয়েও উঁচু ছিল। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে মন্দিরটা ধ্বসে পড়ে।

কাছেই ছিল গোকুল মিত্তিরের বাড়ি। ইংরেজদের রসদ সরবরাহ করে তিনি বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। এত পয়সা যে বিষ্ণুপুরের রাজারা যখন অর্থসংকটের মধ্যে পড়েছিলেন তখন তাঁরা ওই গোকুল মিত্তিরের কাছে এসেই তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিলেন। ওই বিগ্রহ জাগ্রত জানতে পেরে মিত্তিরমশাই ওর অনুরূপ একটা মূর্তি নির্মাণ করিয়ে সেটাই ফেরৎ দেন বিষ্ণুপুরের রাজাদের, যখন তারা ঋণ পরিশোধ করতে আসেন। আসল মূর্তিটা বাগবাজারে গোকুল মিত্তিরের বাড়িতেই থেকে যায়। সেই জন্যই জায়গাটার নাম হয় মদনমোহনতলা। গোকুল মিত্তির খুব ঘটা করে রাসযাত্রা উৎসব করতেন। ওঁর বাড়ির সংলগ্ন ছিল এক বিরাট দিঘি। রাসের সময় ওই দিঘিতে চারখানা নৌকা ভাসিয়ে মেয়েদের দিয়ে কবি গান শোনানো হত। তাছাড়া গোকুল মিত্তিরের বাড়ির প্রাঙ্গণে রাসের মেলা বসত ও অনেকরকম সঙ বসানো হত।

কাছাকাছিই ছিল কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ি। কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ির কালীপূজা ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাড়ির কর্তা-গিন্নি, বৌ-ঝি, ছেলে-পিলে, এমনকি ঝি-চাকর পর্যন্ত সেদিন মদ খেয়ে একেবারে চুর হয়ে থাকত। বহু ছাগ, মহিষ, বলি হত। একবার তো মদের ঝোঁকে কালীশঙ্কর নিজের গুরুদেবকে পর্যন্ত বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

গোকুল মিত্তিরের বাড়ির বিপরীত দিকে ছিল এক জোড়বাংলা মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে ডাকাতরা নরবলি দিত। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে ওই মন্দিরটা পড়ে যায়।

বাগবাজারের যে-ঘাটে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে আসতেন, তারই সামনে ছিল ইংরেজদের বারুদখানা। ওখানেই ইংরেজরা স্থাপন করেছিলেন এক তোপমঞ্চ, সিরাজ যখন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলকাতা আক্রমণ করে তখন তাকে প্রতিহত করবার জন্য। আবার ওই বারুদখানার সামনের রাস্তা চিৎপুরের পথ দিয়েই যেত কালীঘাট দর্শনে পুণ্যার্থীর দল।

এই বারুদখানার দক্ষিণেই ছিল পেরিন সাহেবের বাগান-বাড়ি, যেখানে হামেশাই আসতেন ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও শহরের উঁচু মহলের সাহেব-মেমেরা সান্ধ্যভ্রমণ করতে। সেই বাগানটার জমিতেই এখন কলকাতা করপোরেশনের 'মেটাল ইয়ার্ড', যেখানে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। ওই পেরিন সাহেবের বাগানের 'বাগ' শব্দ থেকেই বাগবাজার নামের উদ্ভব। ওই বাজারের পেছনেই ছিল রসিক নেওগীর বাড়ি, যিনি ওঁর বাড়ির সামনে গঙ্গার ধারে তৈরি করে দিয়েছিলেন কলকাতার একমাত্র চাঁদোয়া বিশিষ্ট ঘাট, নাম 'রসিক নেওগীর ঘাট', লোক মুখে যা অন্নপূর্ণার ঘাট নামে প্রসিদ্ধ, কেননা, ওর সামনেই ছিল অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির। ওই ঘাটের ওপরেই ছিল নেওগীদের বৈঠকখানা, যেখানে গিরিশ, ধর্মদাস, অর্ধেন্দু প্রমুখেরা নাটকের রিহারসেল দিত। ওই নেওগী বংশেরই ভুবনমোহন নেওগী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। আবার ওই নেওগী বংশেরই অপর এক বংশাবতংস কৃষ্ণকিশোর নেওগীর ছিল এক বিরাট গ্রন্থাগার, যা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারের চেয়েও ছিল বড়। এটি নেওগী মশাই দান করেছিলেন 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'কে (জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বজ) ওই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময়।

কুমোরটুলির কথায় আমি আবার ফিরে আসছি। কুমোরটুলিতে এখন কুমোররা বাস করে। কিন্তু কুমোররা যে এক একজন জাতশিল্পী, সে বোধ আমদের ছিল না। সেটা প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম যখন একজন কুমোর রাজ-সমাদর পেয়েছিলেন। কুমোর পাড়ার তখন তিনি সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন। নাম গোপেশ্বর পাল। তাঁর হাতে ও কল্পনায় ছিল ভগবানের অসীম করুণা। দু-চার মিনিটের মধ্যে তিনি যে কোনো লোকের আবক্ষমূর্তি তৈরি করে দিতে পারতেন। তাঁর শিল্পশক্তির পরিচয় দেবার জন্য তিনি বিশের দশকের গোড়ায় (১৯২৪) আহূত হয়েছিলেন বিলাতের 'ব্রিটিশ এমপায়ার একজিবিশনে'। সেখানে তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছিলেন ডিউক-অফ কেন্টের আবক্ষ মূর্তি। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দর্শকরা। গোপেশ্বর পালের সমকক্ষ না হোক, ওরকম শিল্পী কুমোরটুলিতে বহুকাল ধরেই আছে।

এসব কীর্তিমান লোকের কথা মনে পড়িয়ে দেয় ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের (I.F.A) প্রথম ভারতীয় সম্পাদক প্রফুল্ল মুখুজ্যেকে। বাগবাজারেই ছিল তাঁর বাড়ি। তিনি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। প্রায়ই বলতেন, জানো অতুল, বাগবাজারের গণ্ডমূর্খ আর নদের (নবদ্বীপের) পণ্ডিত, এই দুই-ই সমান।' একটা ঘটনা বলি। কিশোরদা ছিলেন বাগবাজারের এক গণ্ডমূর্খ। কিন্তু তাঁর যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলো নদের পণ্ডিতেরাও খণ্ডাতে পারত না। ভোরবেলা গঙ্গার ধারে কিশোরদার সঙ্গে দেখা।

কিশোরদা জিজ্ঞাসা করল, 'এত ভোরে এখানে কী করছিস?' বললাম, 'একটা শবদাহ করতে এসেছিলাম, নখগুলো কেটে, লোহা ও অগ্নিস্পর্শ তো করতে হবে, তাই একটা নাপিত খুঁজছি।' কিশোরদা বলল, 'তোদের মত বোকা আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি, এত ভোরে নাপিত কোথায় পাবি? 'থ্রী ইন ওয়ান' প্রণালী অবলম্বন কর, তা হলেই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' এই বলেই কিশোরদা আমাকে সামনের গ্যাস পোস্টটার কাছে নিয়ে গেল। আমার হাতটা ধরে রাস্তার নর্দমার পাথরের থানটায় নখগুলো ঘষে দিল, গ্যাস পোস্টটাকে জড়িয়ে ধরতে বলল। তারপর যুক্তি বর্ষণ করল, 'এই তো বাবা নখছেদন, লৌহ ও অগ্নিস্পর্শন—এ তিনটে কাজ এক সঙ্গেই হয়ে গেল। যা এবার গঙ্গা স্নান করে বাড়ি চলে যা।'

যতরকম উদ্ভট জিনিস এই বাগবাজারেই ঘটত। মুখুজ্যেপাড়ায় দুর্গাচরণ মুখুজ্যের বাড়িতে ছিল 'পঞ্চের আড্ডা'। উদ্ভট শখ ওঁদের। অভিজাত পরিবারের ছেলেরা এক একটা পাখির বেশ ধারণ করে ওখানে এক একখানা ইটের ওপর বসে গাঁজা খেত। একবার মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ওঁদের নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। 'পঞ্চের আড্ডা'র সদস্যরা নিজ নিজ বেশ ধারণ করে মহারাজার বাড়ি হাজির হয়। গিয়ে তারা দেখে যে মহারাজা তাদের জন্য সোনা-রূপার থালায় নানারকম সুখাদ্য ভোজ্যদ্রব্য সাজিয়ে রেখেছেন। কিন্তু 'পঞ্চের আড্ডা'র সদস্যরা তাদের লম্বা চঞ্চুর দ্বারা থালা থেকে কিছুই খেতে পারল না। পরন্তু তারা নিজ নিজ আসনে মলত্যাগ করল। মুখুজ্যে মশাই বললেন, যেহেতু পাখিরা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করে, সেই হেতু এরা নিজ নিজ আসনে মলত্যাগ করেছে। মহারাজা হাসতে হাসতে স্বীকার করে নিলেন, তিনি পরাহত।

বাগবাজার স্ট্রিট দিয়ে মুখুজ্যেপাড়ায় ঢুকবার মুখেই ছিল জগদ্বন্ধু দত্তের বাড়ি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কালির ব্যবসা করে তিনি বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তাঁরই অর্থানুকুল্যে তৈরি হয়েছে বাগবাজারের বিখ্যাত গৌড়ীয় মঠ। আবার এই বাগবাজার থেকেই শুরু হয়েছিল নাট্যাভিনয়, প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ও থিয়েটার কালচার। এই বাগবাজারেই দোকানদারি করতেন ভোলা ময়রা, যিনি কবির গানে পরাহত করতেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গিকে। আবার ভোলা ময়রারই নাতজামাই ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস, যিনি স্বনামখ্যাত হয়েছেন রসগোল্লা উদ্ভাবন করে। ওই বাগবাজারেই বাস করতেন বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। এই বাগবাজারের অধিবাসী নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন বাংলা ও হিন্দিতে বিখ্যাত 'বিশ্বকোষ', যার অসাধারণ গুরুত্বে মুগ্ধ হয়ে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের বাড়ী এসেছিলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। ওই নগেন্দ্রনাথের পাশের বাড়িতেই থাকতেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন, যাঁর বাড়িতে দু'-তিনবার এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা। হামেশাই আসতেন নজরুল ইসলাম। আবার একখানা বাড়ি পরেই থাকতেন সেকালের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক দক্ষিণারঞ্জন ন্যায়রত্ন। এই বাগবাজারেরই অধিবাসী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ির সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। এখানেই

বাস করতেন বিখ্যাত পণ্ডিতবংশ ডক্টর পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, অশোক শাস্ত্রী ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী। এখানেই বাস করতেন বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। আবার এখানেই বাস করতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় ও কালজয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যথা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, কিশোরীমোহন ঘোষ, বারীন ঘোষ, হেমন্তকুমার বসু, নির্মলকুমার বসু ও শচীন মিত্র প্রমুখ।

শহরের ভেতর এই বাগবাজারপল্লীর বুকের ওপর দিয়ে যেত রেলগাড়ি, যে রেললাইনের সংযোগ ছিল সারা ভারতের রেলপথের সঙ্গে।

বাগবাজারের সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, এখান থেকে বেরিয়েছিল প্রথম জাতীয় পত্রিকা—'অমৃতবাজার পত্রিকা'। তার দুই কর্ণধার শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সারা ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, অ্যানি বেসান্ত থেকে প্রায় সবাই।

'সমবায় ম্যানসন' তৈরি হবার আগে কলকাতার বৃহত্তম বাড়ি ছিল এই বাগবাজারে—নন্দলাল বসু ও পশুপতি বসুর বাড়ি। বাইশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি। উত্তরাধিকার সূত্রে মামা প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের কাছ থেকে ওঁরা গয়ার জমিদারী পান। বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা। ৬৫নং বাগবাজার স্ট্রিটে একটা খোলা মাঠ ছিল। ওই মাঠেই এক সময় কলকাতার বিখ্যাত গাজন উৎসব, রামধন ঘোষের চড়ক প্রভৃতি মেলা হত। নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু পরে ওই জমিতেই তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি করেন। গৃহপ্রবেশ হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ওঁদের বাড়িতে আসেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য দোতলায় এক বিরাট হলঘর। সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ওই হলঘরে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রথম স্বদেশী মিটিং হয় ওই হলঘরে। আবার পরবর্তীকালে সরোজিনী নাইডু, প্রমুখেরা ওখানেই বক্তৃতা করেন। ওই বাড়ির পশুপতি বসুর অংশটা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে অধিগ্রহণ করেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ওখানে 'ডে স্টুডেন্টস হোম' স্থাপনের জন্য। এছাড়া পরে অবশ্য ওখানে আরও স্থাপিত হয় 'বাগবাজার মালটি-পারপোস্ গার্লস স্কুল'।

বাগবাজার পল্লী সম্বন্ধে আরও দু-এক কথা বলব। বাগবাজারই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মস্থল। মুখুজ্যেপাড়ায় স্বামীজি স্থাপন করেছিলেন 'উদ্বোধন' সংস্থা। শ্রীসারদা মা কলকাতায় এলে ওখানেই থাকতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এখন ওখানে থাকেন। আর বোসপাড়া ছিল ভগিনী নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র। পল্লীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য যে বিদ্যায়তনটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা আজও গৌরবে বিরাজ করছে—'নিবেদিতা স্কুল' নামে। সবশেষে বলি, বাগবাজার আজ অনন্য তার 'গিরিশ মঞ্চ'-এর জন্য। এ অবশ্য এই সেদিনের কথা।

এবার শ্যামবাজার পল্লীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা কিছু বলব। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার কাছেই কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ি। ওঁদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নামেই

'শ্যামবাজার' হয়েছে। কৃষ্ণরাম বসু সেই পলাশী যুদ্ধের আমলের লোক। লবণের ব্যবসা করে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পরে তিনি হুগলির দেওয়ানও হয়েছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কৃষ্ণরাম বসু তখনকার দিনে লাখ টাকার চাল বিতরণ করেন। কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ি ও বাগান বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষ্ণরামের পৌত্র নবীনচন্দ্র বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য শ্যামবাজারে সর্বপ্রথম এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যশালাটি তাঁর বসতবাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর তারিখে এই নাট্যশালায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেননা ওই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ষোড়শ-বর্ষীয়া রাধামণি (রাণী)। মালিনীর ভূমিকায় প্রৌঢ়া জয়দুর্গা। বিদ্যার সহচরীর ভূমিকায় রাজকুমারী বা রাজু। সমসাময়িক 'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল যে এই অভিনয়ে নাকি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল।

শ্যামবাজার প্রসিদ্ধ হয়ে আছে 'মোহন বাগান' ক্লাবের জন্য। এই পল্লীর ফড়িয়াপুকুর পাড়ার অর্ন্তভুক্ত মোহন বাগান লেনের (বর্তমান শ্যামবাজার পোস্ট আপিসের সামনের গলি) নাম থেকেই মোহন বাগান ক্লাবের নামের উৎপত্তি। ফড়িয়াপুকুরের আগের গলি কালাচাঁদ সান্যাল লেনের বাসিন্দা মোহন বাগান ক্লাবের দুই খেলোয়াড় শিব ভাদুড়ি ও বিজয় ভাদুড়ি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। শিব ভাদুড়ির কোলেপিঠে চেপেই আমি বড় হয়েছি। শিব ভাদুড়ির অধিনায়কত্বেই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহন বাগন ২—১ গোলে ইস্ট ইয়র্ক দলকে পরাজিত করে আই. এফ. এ. শিল্ড লাভ করে। আবার ওই শ্যামবাজার পল্লীর রামধন মিত্র লেনের বাসিন্দা উমেশ মজুমদার (ডাক নাম দুঃখীরামবাবু) ছিলেন কলকাতার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের একজন মহানায়ক। তিনি এরিয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শ্যামবাজার পল্লীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল রাস্তায় সার্কাসের এক বাঘ বেরিয়ে। আগে শীতকালে সার্কাস দেখানো হত গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে গড়ের মাঠে সার্কাসের তাঁবু ফেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সময় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট বানাবার জন্য পুরানো কালের যত বসতবাড়ি ছিল, সেগুলোকে ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ফলে যে খোলা জায়গা সৃষ্টি হল, সেই জায়গাতেই সার্কাসগুলো এসে তাঁবু ফেলল। এখানে প্রথম আসে 'ছাত্রেস্ সার্কাস', তারপর 'আগাসী সার্কাস'। একবার বাঘের খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের লোকরা বাঘটাকে আনতে গিয়ে দেখল যে বাঘটা তার খাঁচার মধ্যে নেই। খাঁচার দরজা খোলা। এই খবর রাষ্ট্র হওয়ামাত্র ভীষণ 'প্যানিক'-এর সৃষ্টি হল। দর্শকরা সবাই সার্কাসের তাঁবু ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটল। আশপাশের বাড়ির লোকরা সবাই দরজা বন্ধ করে দিল, পাছে বাঘটা ঢুকে তাদের ঘাড় মটকে দেয়। এদিকে সার্কাসের লোকরা চতুর্দিকে বাঘ খুঁজতে বেরুল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুসন্ধান চলল। কিন্তু কোথাও বাঘটা নজরে পড়ল না। সেদিন

শ্যামবাজার পল্লীতে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হল। রাতে নিশ্চিন্ত মনে কেউই ঘুমুতে পারল না। সকলেরই এক ভাবনা, যদি বাঘটা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পরের দিন বাঘটাকে পাওয়া গেল, সার্কাসের পাশেই এক হাঁড়ি-কলসির দোকানে, কয়েকটা বড় জালার আড়ালে। সার্কাসের লোকরা এসে কান ধরে বাঘটাকে নিয়ে গেল।

আজ শ্যামবাজার সিনেমা ও থিয়েটার পাড়ায় পরিণত হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু তা ছিল না। সবে ধন নীলমণি ছিল হাতিবাগানে 'স্টার থিয়েটার'। সিনেমার নামগন্ধ ছিল না। কী করে এটা সিনেমা ও থিয়েটার পাড়ায় দাঁড়াল, এবার সেই কাহিনীটা বলি। দু-চার বছরের মধ্যেই শ্যামবাজারে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের মাঠগুলোয় ক্রমশ ঘরবাড়ি উঠতে লাগল। সার্কাসওয়ালাদের তখন সেখানে তাঁবু ফেলা আর সম্ভব হল না। সে জন্য 'আগাসী সার্কাস' তাঁবু ফেলল, আজ যেখানে 'শ্রী' ও 'উত্তরা' সিনেমা। তখনকার দিনে ওটা ছিল একটা নোংরা মাঠ—সাধারণের মলত্যাগের স্থান। সার্কাসওয়ালারা মাঠটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ওখানেই তাঁবু ফেলল। গরম পড়তেই আগাসী সার্কাস জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এবার 'ম্যাডান কোম্পানি' ওই জায়গাটাতেই সিনেমা দেখাবার জন্য তাঁবু ফেলল। 'ম্যাডান কোম্পানি' কলকাতায় সিনেমা দেখাতে এসে প্রথম তাঁবু ফেলে গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের (শহিদ মিনার) কাছে। তারপর দেখায় ১৩৮ বিধান সরনীর তাঁবুতে। তখন ম্যাডান কোম্পানির সিনেমার নাম ছিল 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ'। প্রথম প্রথম যেসব ছবি দেখানো হত সেগুলো 'সিরিয়াল'। একবার দেখলে শেষ পর্যন্ত দেখতেই হতো। সেজন্য টিকিট কেনবার জন্য খুব ভিড় হত, আর ম্যাডানের জামাই রুস্তমজি ভিড় সামলাবার জন্য একগাছা ঘোড়ার চাবুক দিয়ে লোকগুলোকে নির্দয়ভাবে কষাঘাত করত। সে যুগ বলেই এটা সম্ভব ছিল। এ যুগ হলে রুস্তমজির রক্তাক্ত দেহ রাস্তায় গড়াগড়ি খেত। হাতিবাগানের তাঁবুতে ম্যাডান কোম্পানি কয়েক বছর সিনেমা দেখিয়েছিল। তারপর একদিন আগুন লেগে তাঁবুটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেকদিন সিনেমা দেখানো বন্ধ থাকে। তারপর ওই জায়গায় ম্যাডান কোম্পানি পাকা ইমারত তৈরি করে নাম দিল 'কর্নওয়ালিস থিয়েটার'। এখানে অনেকদিন সিনেমা দেখাবার পর, ম্যাডান কোম্পানি থিয়েটারটা ভাড়া দিল শিশির ভাদুড়ি মশাইকে, ওখানে অভিনয় করবার জন্য। আর ম্যাডান কোম্পানির ওর পাশেই একটা সিনেমা 'হল' করল, নাম দিল 'ক্রাউন সিনেমা'।

তখনকার দিনে সিনেমার সব ছবিই নির্বাক হত। এবং অনেক ছবিতেই বিবস্ত্রা নারীর ছবি দেখানো হত। আমার যতদূর মনে পড়ে 'নেপচুনস্ ডটার'ই শেষ ছবি, যাতে নগ্নিকার ছবি ছিল। তারপর এরকম ছবি দেখানো বন্ধ করবার জন্য সরকার স্থাপন করলেন 'বোর্ড অব ফিলম্ সেন্সর'।

জীবনে অনেক কিছুই আপতিকভাবে ঘটে। শ্যামবাজার সিনেমা-থিয়েটার পাড়াতে পরিণত হওয়াও কতকটা তাই। সার্কাস দেখাবার জন্য 'আগাসী সার্কাস' যদি

না শ্যামবাজারের ওই নোংরা মাঠটা পরিষ্কার করত, তা হলে ওই অঞ্চলটা সিনেমা-থিয়েটার পাড়ায় পরিণত হত কি না সন্দেহ। ওটা উত্তর কলকাতার সবথেকে জমজমাট স্থানও হত না। ওই জায়গায় ম্যাডান কোম্পানি কর্তৃক সিনেমা হাউস তৈরি হবার পর, ওর কাছাকাছি জায়গায় (ওখানে একটা রেড়ির তেলের কল ছিল) প্রখ্যাত আইনবিদ্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র বীরেন সরকার মশাই 'চিত্রা' নামে একটা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করলেন। এবার ফড়িয়াপুকুর ও সারকুলার রোডের সংযোগস্থলের কাছে 'শো হাউস' নামে একটা সিনেমা-ঘর তৈরি হল। তারপর কীর্তি মিত্রের বাড়ির জমিতে এবং 'চিত্রা'র কাছে 'দর্পণা' সিনেমা তৈরি হল। তারপর একে একে গড়ে উঠল ১৩৮/২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে 'উত্তরা', ১৩৮ নং-এ 'শ্রী', ১২৬/২এ 'মিনার', ১৪০ নং-এ 'রাধা', ৭৬/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে 'রূপবাণী' (এর নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। এখন তো কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা হাউস। কলকাতায় এখন নাকি ১০৫টা সিনেমা হাউস আছে।

হাতিবাগানে এখন যেখানে স্টার থিয়েটার অবস্থিত, আগে কিন্তু 'স্টার' ওখানে ছিল না। ছিল বিডন স্ট্রিটে। আসলে বিডন স্ট্রিট-টাই তখন ছিল থিয়েটার পাড়া, কেননা ওখানেই বাগবাজারের ধনী ভুবনমোহন নেওগী মশাই ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন। এরই কাছাকাছি জমিতে (৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটার স্থাপিত হয়। স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় 'দক্ষযজ্ঞ', যা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেখতে আসেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই তারিখে 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিকবাজার' অভিনয়ের পর স্টার থিয়েটার বিডন স্ট্রিট থেকে হাতিবাগানে নিজ বাড়িতে উঠে আসে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে তারিখে হাতিবাগানের বাড়িতে 'নসীরাম' নাটক অভিনীত হয়।

এরপর ১৩৮ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) ম্যাডান কোম্পানি কর্ণওয়ালিস থিয়েটার (আগে দেখুন) স্থাপন করেন। এখানেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তারিখে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। মতভেদ হওয়ায় শিশিরকুমার ম্যাডান কোম্পানি ত্যাগ করে, কয়েকজন প্রতিভাবান নট-নটীদের নিয়ে এক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে 'নাট্যমন্দির' নাম দিয়ে ওখানে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' অভিনয় করেন। নাট্যমন্দিরের মোট মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এবং ডিরেক্টর ছিলেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার তাঁর 'নাট্যমন্দির' কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে স্থানান্তরিত করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র গুহ মশাই স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ করে, ওখানে 'আর্ট থিয়েটার' গঠন করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটার ভাড়া নিয়ে, ওখানে 'নব নাট্যমন্দির'

প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে নাট্যনিকেতন স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীরঙ্গম' (নাট্যনিকেতনের নূতন নাম)। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরঙ্গমের নামান্তর করা হয় 'বিশ্বরূপা'। 'রঙ্গনা' থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে এই সেদিন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

শ্যামবাজার এই ভাবে ক্রমশ সিনেমা-থিয়েটার পাড়ায় পরিণত হল। এই নূতন সিনেমা-থিয়েটার পাড়ার মধ্যেই আবির্ভূত হন সেকালের একজন প্রতিভাবান পরিচালক তথা অভিনেতা—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও আইনবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশাইয়ের ছোট ভাই। তিনি থিয়েটার মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা, ঠ্যালা সীন প্রভৃতি প্রবর্তন করে নাট্যশালার দৃশ্যপট ও সাজসজ্জায় নতুনত্ব আনেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাষায় তিনি ছিলেন বঙ্গ রঙ্গ জগতের 'নেপোলিয়ান'। তাঁর অভিনয়ের অবিস্মরণীয় অংশ হচ্ছে মঞ্চের ওপর অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভাব ও রোহিণীকে জলের তলা থেকে তুলে ভিজে কাপড়ে মঞ্চে উঠে আসা। এই অমরেন্দ্রনাথই ছিলেন স্টার থিয়েটারের প্রাণপুরুষ।

ইংরেজরাই এদেশে 'থিয়েটার কালচার' আমদানি করেছিল। ইংরেজদের প্রথম থিয়েটারটা ছিল লালবাজারের কাছে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেবেদেফ নামে এক রুশ দেশীয় ভদ্রলোক কলকাতার ডোমতলায় এক অস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন করে কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। তবে দুদিন অভিনয়ের পর তিনি দেশে ফিরে যান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজরা কলকাতায় 'এথেনিয়াম থিয়েটার', 'বৈঠকখানা থিয়েটার', 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'সানস্ সূচি থিয়েটার' প্রভৃতি নামে আরও কতকগুলি থিয়েটার স্থাপন করেন।

সাহেবদের দেখাদেখি বাঙালিরাও নাটক অভিনয় শুরু করে দিল। বড়লোকের বাগান বাড়ি, বসতবাড়ি ও স্কুলবাড়িতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বেঁধে বিলাতী কায়দায় নাটক অভিনয় শুরু হয়। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৮-র মধ্যে কয়েকটা নাট্যসমাজও স্থাপিত হয়। যথা 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি', 'বৌবাজার নাট্যসমাজ', 'বাগবাজার নাট্যসমাজ', 'আরপুলি নাট্যসমাজ', প্রভৃতি। এদের মধ্যে 'বাগবাজার নাট্যসমাজই ছিল প্রধান, কেননা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রমুখেরা। ১৮৭৩ সালে কলকাতায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার পূর্বে এঁরা ২নং বৃন্দাবন পাল লেনে রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে অভিনয় করেন। ওই বাড়ির দু'খানা বাড়ি আগেই ছিল দক্ষিণারঞ্জন সেন-এর 'ব্লু রিবন কনসার্ট' ক্লাব। দক্ষিণারঞ্জনবাবু ছিলেন বাংলার 'কনসার্ট সঙ্গীত'-এর অন্যতম প্রবর্তক। তবে শ্যামবাজারের সবচেয়ে বড় কনসার্ট। বা অর্কেষ্ট্রা বাদন ক্লাব হচ্ছে কমবুলিয়াটোলার ননী নেওগীর কনসার্ট ক্লাব। ননী নেওগীর অর্কেস্ট্রা দল আমন্ত্রিত হতেন এমন কি বড়লাট লর্ড রিপনের উৎসব অনুষ্ঠানে কনসার্ট বাজাবার জন্য। তাছাড়া, তাঁরা পরেশনাথের মিছিলেও কনসার্ট বাজাবার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। কানসার্ট বাজানো

সম্বন্ধে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে আগেকার দিনে সাধারণ রঙ্গালয় সমূহে অভিনয় আরম্ভ হবার আগে বেশ কিছুক্ষণ কনসার্ট বাজানো হত। অভিনয়ের পূর্বে কনসার্ট বাজানো বন্ধ হয়ে যায় যখন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার ভাদুড়ি মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ওখানে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক অভিনয় করেন। তিনিই কনসার্টের বদলে রসন চৌকির প্রবর্তন করেন।

আর একটা কথা বলি। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথাটাকে আমরা কিন্তু সেকালে চৌমাথা বলতাম। তার কারণ, এটা ছিল চারটা রাস্তার মিলনস্থল। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ও ভূপেন বোসের রাস্তা পরে হয়। মিলনস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণের জন্য একটা প্রস্রাবাগার। সেখানেই আজ স্থাপিত হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অশ্বারোহী মূর্তি। আর. জি. কর রোড বিস্তৃত হয়ে বড় রাস্তায় পরিণত হবার পূর্বে ওটা ছিল একটা অতি সঙ্কীর্ণ সরু রাস্তা। নাম ছিল শ্যামবাজার ব্রিজ রোড। রাস্তাটার ডানদিকে ছিল এক অতি গভীর ও চওড়া খোলা নর্দমা। বাঁশের মাচার ওপর দিয়ে দোকানঘরগুলিতে প্রবেশ করতে হত। দোকানগুলি সবই জামাকাপড় ও জুতোর দোকান। পূজার সময় লোক ছেলেমেয়েদের জন্য ওখান থেকেই জামাকাপড় কিনত। তখন তো আর কলেজ স্ট্রিট মার্কেট হয়নি। ওখানে ছিল খোলার ঘরে সারি সারি চটি জুতা ও পুরাতন বইয়ের দোকান। দু-একটা পুরানো চটিজুতার দোকান বোধহয় এখনো রয়েছে। তবে নব রূপে। সেযুগে সিমেন্ট ও ইলেকট্রিসিটি ছিল না বলে পাড়ায় পাড়ায় সুরকির ও রেড়ির তেলের কল ছিল।

দুই

আমার ছেলেবেলায় কলকাতার মর্যাদাই ছিল আলাদা। কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। এটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। লন্ডনের পরেই ছিল এর স্থান। খানিকটা তারই আদলে। এর আরেকটা অভীধাও ছিল। এটা ছিল প্রাসাদপুরী (City of Palaces)। সত্যিই এর সাহেব পাড়াটা ছিল তাই। এটা ছিল ধর্মতলার দক্ষিণে। ওর উত্তর দিকটাকে বলা হত 'নেটিভ পাড়া'। তখন ভারতীয়দের 'নেটিভ' বলা হত—'ইন্ডিয়ান' নয়। দুটো পাড়া স্বতন্ত্র হলেও, সাহেবরা কিন্তু দুটো পাড়াকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত। ভোরবেলা নেটিভ পাড়ায় লোকজন ঘুম থেকে ওঠবার আগেই ঝাড়ুদাররা রাস্তা ঝাঁট দিত। ঝাড়ুদারদের এই ঝাঁট দেওয়ার শব্দই আমাদের কাছে অ্যালার্ম ঘড়ির কাজ করত। শব্দটা শুনেই আমরা ঘুম থেকে উঠে পড়াশুনায় মন দিতাম।

রাস্তা দিনে দুবার ঝাঁট দেওয়া হত। একবার ভোরবেলা, আর একবার দুটো-তিনটের সময়। ঝাঁট দিয়ে আবর্জনাগুলো এক নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো করে রাখা হত।

ঝাড়ুদারদের কাজ শেষ হবার আগেই শব্দ শোনা যেত আবর্জনা নিয়ে যাবার গাড়ির। এগুলো ছিল ঘোড়ায় টানা 'টেম্পো' ধরনের লোহার গাড়ি। তবে গলিঘুঁজির ভিতর গাড়িগুলো যেত না। গলিঘুঁজির ভিতর থেকে ঝাড়ুদাররাই তিন চাকার ঠেলাগাড়ি করে আবর্জনা বড় রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে এনে রাখত। সেখান থেকে

ঘোড়ায়-টানা আবর্জনাবাহী লোহার গাড়িগুলো সেগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আমাদের শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলে আবর্জনাবাহী ঘোড়ার গাড়িগুলো আবর্জনা দু'জায়গায় নিয়ে গিয়ে জড়ো করত। একটা জায়গা ছিল বাগবাজারে অন্নপূর্ণার ঘাটের সামনে একটা সরু গলির ভিতর। আর একটা ছিল সারকুলার রোড (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ও উল্টাডাঙা রোডের মোড়ের কাছে। ওখানে একটা উঁচু পাকা প্ল্যাটফর্ম ছিল তার দু'দিক ছিল ঢালু, যাতে ওই গাড়ি প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে আবার বিপরীত দিক দিয়ে নেমে আসতে পারে। ওই প্ল্যাটফর্মের ওপর শহরের যত আবর্জনা জড়ো করা হত।

শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ পর্যন্ত শহরের ভিতর দিয়ে করপোরেশনের একটা রেলপথ ছিল। এই রেলপথটা তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে। তার মানে করপোরেশন গঠিত হবার পাঁচ বছর পরে। এটা বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে থেকে শুরু করে সমস্ত বাগবাজার স্ট্রিটের উত্তরাংশ দিয়ে কর্ণওয়ালিশ (এখন বিধান সরণী) স্ট্রিটে এসে সারকুলার রোড ধরে ধাপা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আগে সারকুলার রোড ও উল্টাডাঙার মোড়ের কাছে যে প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছি, রেলগাড়িটা ওই প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে যেত। প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে সমস্ত আবর্জনা রেলগাড়িতে ভর্তি করে দেওয়া হত। অনুরূপ প্ল্যাটফর্ম ছিল রাজাবাজারের কাছে। সেখানেও আবর্জনা ওই রেলের মালগাড়িতে ভর্তি করা হত। এরকমভাবে আবর্জনা নিতে নিতে রেলগাড়িটা ধাপা পর্যন্ত গিয়ে খালাস হত।

রেলগাড়িটা করপোরেশনের আর একটা কাজেও লাগত। রেলপথটার সংযোগ ছিল ইস্টার্ন রেলের (তখন নাম ছিল 'ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে') চিৎপুরের রেল ইয়ার্ডের সঙ্গে। কলকাতার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য এবং ফুটপাতের ধারে ও নর্দমায় বসাবার জন্য করপোরেশনের দরকার হত অনেক পাথরকুচি ও পাথরের থান বা স্ল্যাব। এগুলো রেলপথে বাইরে থেকে আসত। এবং মালগাড়িগুলো চিৎপুর রেল ইয়ার্ডে এসে পৌঁছলে পর, সেগলিকে টেনে আনা হত পোর্ট ট্রাস্টের রেলপথ দিয়ে (আজ সেটাকেই পরিণত করা হয়েছে চক্ররেলে) অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে। তারপর করপোরেশনের রেল ওগুলোকে টেনে এনে খালাস করত করপোরেশনের 'মেটাল ইয়ার্ডে'। 'মেটাল ইয়ার্ড' ছিল আজ যেখানে 'বাগব'জার সার্বজনীন দুর্গোৎসব' হয় সেখানে। প্রথম যখন এই পূজা হয় (১৯২৪) তখন জায়গাটা আরোও বিস্তীর্ণ ছিল। এখন এটাকে সঙ্কুচিত করে আনা হয়েছে। এ জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে, তখন (এখানকার) খালধার পর্যন্ত উত্তর দিকের জমি সমেত ওখানে ছিল পেরিন সাহেবের (এক অবৈধ বনিক বা interloper) বাগানবাড়ি ও জাহাজ ঘাটা। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে, তখন ইংরেজরা এখানেই স্থাপন করেছিল একটা তোপমঞ্চ (battery), এবং এখানেই হয়েছিল দুই পক্ষের প্রথম যুদ্ধ। পরে ওটা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শ্বশুরমশাই কিনে নিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে ওয়ারেন হেস্টিংস মাঝে মাঝে বাগবাজারের ওই বাগানবাড়িতে এসে বাস করতেন।

আমার ছেলেবেলায় রাস্তাঘাট ঠিক এখনকার মত চকচকে পিচের ছিল না। তবে সে যুগের মান অনুযায়ী রাস্তাঘাট ভালই ছিল। প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে রাস্তাঘাট মেরামত করা হত। প্রথমে রাস্তার তলায় ঝামা দেওয়া হত, তার ওপর দেওয়া হত পাথরের খোয়া ও তার উপর পাথরকুচি। প্রত্যেক মালটাই স্টিম-রোলার দিয়ে ভাল করে পেষণ করা হত। পাথরকুচি পেষণ করে রাস্তা একেবারে সমতল ও মসৃণ করা হত। তারপর তাকে আরও মসৃণতর করা হত তার ওপর সুরকি বা রাবিশচূর্ণ দিয়ে।

রাস্তার একেবারে ওপরটা রাবিশচূর্ণ দিয়ে মসৃণ করা হত বলে, সেগুলো শুকিয়ে গেলে ধূলো হত। যাতে ধুলো না ওড়ে সেজন্য দিনে দু-তিনবার জল দেওয়া হত। রাস্তায় জল দেবার জন্য ফুটপাতের ধারে গঙ্গাজলের চাপা কল বসানো থাকত, যা কোথাও কোথাও এখনো দেখা যায়। দু'জন লোক রাস্তায় জল দেবার জন্য তাদের সরঞ্জাম নিয়ে একটা চাপা কল থেকে আর একটা চাপা কলে ছুটে যেত। সরঞ্জামের মধ্যে ছিল একটা চার ইঞ্চি ব্যাসের মোটা (hose) পাইপ। তার একদিকে লাগানো থাকত একটা তামার তৈরি লম্বা নল, আর অপর দিকে থাকত প্যাঁচ দিয়ে রাস্তার চাপা কলের সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্য একটা পিতলের প্যাঁচ কল। ওই অংশটা লগিয়ে একটা ইংরেজি 'T' আকারের রেঞ্জ দিয়ে কলটার চাবি খোলা হত, যাতে কল থেকে খুব তোড়ে জল বেরোয়। তারপর অপর ব্যক্তি লম্বা নল বিশিষ্ট অংশটি ধরে রাস্তাটাকে বেশ করে ভিজিয়ে দিত। কোথাও আগুন লাগলে জলের জন্য দমকলবাহিনীও রাস্তার ওই চাপাকলের জল ব্যবহার করত। তবে প্রসঙ্গত বলি যে তখনকার দিনে দমকলের গাড়ি ঘোড়ায় টানত। তারা অবশ্য খুবই তৎপরতার সঙ্গে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হত।

তবে চৌরঙ্গী অঞ্চলে রাস্তায় জল দেওয়া হত না। সেখানে রাস্তা কেরোসিন তেল দিয়ে পালিশ করা হত। তখনকার দিনে প্রত্যেক সওদাগরী অফিসের সব ঘরের মেঝেও কেরোসিন তেল দিয়ে পালিশ করা হত। সাহেবপাড়া আর দেশীপাড়ার মধ্যে আর একটা বিষয়েও প্রভেদ ছিল। সেটা হচ্ছে রাস্তার ফুটপাতের। কলকাতার প্রথম ফুটপাত তৈরি হয় ১৮৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। সাহেবপাড়ার ফুটপাতগুলো ঢাকা ছিল বড় বড় চৌকো পাথরের থান (slab) দিয়ে। যে সময়ের কথা বলছি সেটা আমার ছেলেবেলার, তখনো সিমেন্টের প্রচলন হয়নি। দেশীপাড়ার ফুটপাতগুলো ছিল একেবারে কাচামাটির। তার ফলে বর্ষাকালে ফুটপাত দিয়ে হাঁটলে (না হাঁটলে আদালতে শাস্তি পেতে হত, পরে দেখুন) পায়ে একগোছ কাদায় ভরে যেত। দেশীপাড়ার যেখানে ফুটপাত পাথরের থান দিয়ে বাঁধানো ছিল, তা হেদুয়ার ধারে বেথুন কলেজের সামনে ও তার অপর দিকের ফুটপাতে। এটা আমার মনে হয় জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (অধুনা স্কটিশচার্চ কলেজ) ও বেথুন কলেজের মেয়েদের সুবিধার জন্য। দেশীপাড়ার ফুটপাতগুলো প্রথম সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয় প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময়।

ফুটপাত সম্বন্ধে প্রসঙ্গত আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। প্রতি রাস্তার মোড়ে চার ভাষায় লিখিত কমিশনার অব পুলিশের বিজ্ঞপ্তি ছিল—'যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত ফুটপাত ব্যতীত রাস্তা দিয়ে চলিলে, অপরাধী অভিযুক্ত হইবে ও শাস্তি পাইবে।' রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটত, পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যেত। সেজন্য সকলকেই ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হত। তখনকার দিনে ফুটপাত ভাড়া দেওয়াকে করপোরেশন অত্যন্ত গর্হিত ও জঘন্য কাজ বলে মনে করত। ফুটপাতের ওপর দোকানদারি হত না।

এছাড়া, প্রতি রাস্তার মোড়ে দমকলের একটা করে 'পিলার বক্স' ছিল। কোথাও আগুন লাগলে পিলার বক্স-এর কাঁচ ভেঙে হ্যান্ডেল ঘুরালেই দমকল এসে সেখানে হাজির হত। গোড়ার দিকে দমকল অবশ্য ঘোড়ায় টানত।

তবে কলকতায় তখন এত বড় বড় রাস্তাঘাট ছিল না। গলিঘুঁজি অবশ্য অনেক ছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসতে হলে মাত্র একটা রাস্তাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। সেটা হচ্ছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরণী) ও তার প্রসারিত দক্ষিণাংশ অর্থাৎ কলেজ স্ট্রিট ও ওয়েলিংটন স্ট্রিট। অবশ্য আরো দুটো রাস্তা ছিল—সারকুলার রোড যার আধখানা দখল করে রেখেছিল ময়লা ফেলা রেলগাড়ি, আর চিৎপুর রোড যেটা কলকাতার সবচেয়ে পুরানো রাস্তা ও অতি সঙ্কীর্ণ। এর কোনটাই কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মতো প্রশস্ত ও সুন্দর ছিল না। এর সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। রাস্তার দুধারে ছিল দশ-বিশ হাত অন্তর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছগুলোতে যখন ফুল ফুটত, মনে হত রাস্তার দুধারের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে লাল ফুলের ঢেউ।

সেজন্য যখনই ছোটলাট ও বড়লাট (তখন দুজনেই কলকাতায় থাকতেন) কলকাতা থেকে বারাকপুরের লাট ভবনে যেতেন তখন এই রাস্তা দিয়েই যেতেন। তাছাড়া, এই রাস্তা দিয়ে প্রতি রবিবার কেল্লার (ফোর্ট উইলিয়ামের) গোরা সৈন্যরা দলবদ্ধ হয়ে মার্চ করতে করতে দমদম এবং বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে যেত।

তবে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মাঝে মাঝে খোলার চালের ঘর বাড়িও ছিল। এরূপ একসারি ঘর ছিল ঠনঠনিয়া থেকে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত। এগুলো ছিল স্কুল-কলেজের বইয়ের পুরানো বইয়ের দোকান। এগুলো উচ্ছেদ করেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেট তৈরি হয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের শোভা ছিল 'সেনেট হাউস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পুর্তির সময় ওটা ভেঙে দেওয়া হয়। ওর পাশেই ছিল মাধব বাবুর বাজার। বিশের দশকে ওটা উচ্ছেদ করে আশুতোষ বিলডিং তৈরি করা হয়।

আর পূব দিক থেকে পশ্চিমে যাবার বড় রাস্তাগুলো ছিল যথাক্রমে ধর্মতলা স্ট্রিট, বৌবাজার স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড, বিডন স্ট্রিট, গ্রে স্ট্রিট, শ্যামবাজার স্ট্রিট ও বাগবাজার স্ট্রিট। বিডন স্ট্রীট তৈরি হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, গ্রে স্ট্রীট ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ও হ্যারিসন রোড ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এর মধ্যে বিডন স্ট্রিট ও শ্যামবাজার স্ট্রিটের একটা ঐতিহ্য ছিল, কেননা এ দুটো রাস্তা দিয়ে রাস পূর্ণিমার দিন পরেশনাথের মিছিল যেত। (এখন সেই মিছিলের আর প্রাচীন সমারোহ নেই)

একবার মিছিলের সময় শ্যামবাজার স্ট্রিট মেরামত হচ্ছিল। সেজন্য পরেশনাথের মিছিল গ্রে স্ট্রিট দিয়ে যায়। এরপর থেকে মিছিলটা ওই রাস্তা দিয়েই যেতে থাকে।

সাহেবপাড়ার সঙ্গে দেশীপাড়ার রাস্তাঘাটের তফাৎ থাকলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজ আমলে করপোরেশন কলকাতার রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য যতটা সচেষ্ট ছিল, পরবর্তী যুগে আর সেটা লক্ষ্য করিনি। আমার ছেলেবেলার যুগে যদি পণ্ডিত নেহরু কলকাতা এসে এটাকে 'নোঙরা শহর' বলতেন, (স্বাধীনতা লাভের পর যা তিনি বলেছিলেন), তা হলে তিনি সত্যের অপলাপ করছেন বলেই ধরে নিতাম।

পাছে লোকে রাস্তার যেখানে-সেখানে প্রস্রাব করে, সে জন্য প্রতি ২৫০ গজ অন্তর একটা করে সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্রাবাগার ছিল। এছাড়া প্রতি গলির মুখে দু'ভাষায় লেখা থাকত 'Commit No Nuisance', 'এখানে প্রস্রাব করিও না'। পুলিশও ওঁত পেতে থাকত। প্রস্রাব করলেই ধরে নিয়ে যেত। সাজা এক রাত্রি হাজতবাস ও পরদিন আদালতে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা জরিমানা। এখন সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই প্রস্রাবগারগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পথচারী, ফেরিওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতি রাস্তাতেই প্রস্রাব করে।

এছাড়া শহরের বহু জায়গায় ছিল বড় বড় 'হামাম'। এগুলোকে আমার ছেলেবেলায় 'হৌস্' বলা হত। এগুলো ছিল সাধারণের স্নান করবার ও কাপড় কাচবার জায়গা। মেয়ে ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এরকম 'হৌস্' কলকাতা শহরে কয়েক শত ছিল। এখন আর সেগুলো নেই। তবে এখনো নজরে পড়ে দু-তিনটা 'হৌস্'। একটা শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের সামনে মোহন বাগান লেনে ঢুকতে বাম দিকে; একটা রাজাবাজারের সামনে; আর একটা প্রিনসেপ স্ট্রিটে।

উনিশ শতকের ছয়ের দশকে প্রথম মাটির তলায় জলনিকাশের জন্য ড্রেন পাইপ বসানো হয়। মাটির তলায় জলনিকাশের ব্যবস্থা হবার পর করপোরেশন শহরবাসীদের পাকা পায়খানা নির্মাণ করতে পরামর্শ দেয়। তার আগে খাটা পায়খানাই ছিল।

শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রথম কতকগুলি পুষ্করিণী ছিল। যেমন লালদিঘি, গোলদিঘি, হেদুয়া প্রভৃতি। ময়দানে চৌরঙ্গি রোড ধরে ছিল দু-একটা 'তড়াগ'। তারপর নলের সাহায্যে জল সরবরাহ শুরু করা হয়। এই উদ্দেশ্যে মাটির তলায় কয়েকটি জলাধার সৃষ্টি করা হয়। শহরের ভিতর এরকম জলাধার তৈরি করা হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও বিডন স্কোয়ারে। তারপর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে টালার ওপরতলার জলাধারটা নির্মিত হয়। এটা নির্মিত হাবার পর করপোরেশন এক খুব বৃহদাকার (পাঁচ ফুট ব্যাস) নল বসালেন। এই বৃহদাকার নলটা আছে সারকুলার রোডের নীচে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ টালায় মাটির তলাতেও কতকগুলি জলাধার নির্মিত হয়। তার আগে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পলতার জলাধার ও পাম্পিং স্টেশন প্রসারিত হয়। পথিকদের পানীয় জলের জন্য রাস্তায় ফুটপাতের

ধারে বিশ-পঞ্চাশ গজ অন্তর অন্তর টেপা কল বসানো হল। প্রসঙ্গত বলি যে শহরের নানা স্থানে ছক্কর গাড়ির ঘোড়াদের পানের জন্য ফুটপাতের ধারে লোহার তৈরি জলাধারও ছিল। যেটুকু মুখ নামিয়ে ঘোড়া জল খেতে পারে, সে তো আর বসতে-শুতে পারবে না। রাজাবাজারে এখনো এই রকম জলাধার আছে।

আমার ছেলেবেলায় শহরবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি করপোরেশন বিশেষভাবে অবহিত ছিল। যাতে শহরে ভেজাল দ্রব্য বা পচা মাছ বা জল মেশানো দুধ না বিক্রয় হয়, তার জন্য ছিল করপোরেশনের ডাক্তার। তারা রাস্তায় রাস্তায় ও বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াত। রাস্তায় গোয়ালাদের ধরে ল্যাকটোমিটার যন্ত্র দুধের মধ্যে ফেলে দিত। যদি দুধে জল আছে দেখা যেত, তা হলে সে দুধ ফুটপাতের ধারেই ফেলে দিত। আমার ছেলেবেলায় কলকাতায় টাকায় আট সের দুধ পাওয়া যেত। বাজারের পচা মাছও ফুটপাতের ধারে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হত। আমার ছেলেবেলায় মাছের দাম ছিল তিন-চার আনা সের। বাতিল করা পচা মাছ বাজারের বাইরে নর্দমায় গাদা গাদা হামেশা দেখতে পাওয়া যেত। ডাক্তারদের এই ব্যাপারে সাহায্য করত করপোরেশনের পুলিস। করপোরেশনের নিজস্ব পুলিস ফোর্স ছিল। সাধারণ পুলিসের সাদা পোশাক ও লাল পাগড়ি ছিল, আর করপোরেশনের পুলিসের খাকি পোশাক ও নীল পাগড়ি। দু'দলেরই হাতে থাকত লম্বা লাঠি। করপোরেশনের পুলিসের মুখ্য কাজ ছিল শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা। তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখত যানবাহন টানা গরুঘোড়াকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা। তখন কলকাতা পুলিসের কোনও ট্রাফিক পুলিশ ছিল না।

তখন শহরের যানবাহন বলতে ছিল ঘোড়ার গাড়ি। এছাড়া পালকি ও মালবহনকারী গরু ও মহিষের গাড়ি। এই সকল গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদির লাইসেন্স করপোরেশনই দিত। এখনকার মতো পুলিস নয়।

শহরে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে মাত্র করপোরেশনের নিযুক্ত ডাক্তার ছিল, তা নয়। তখন কলকাতা শহরের বহু জায়গায় ছিল গোয়ালাদের খাটাল। বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় ও গোয়াবাগানে এরকম বহু বড় বড় খাটাল ছিল। খাটাল সমূহে গরুগুলিকে যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়, তা প্রদর্শনের জন্য করপোরেশন একটা 'আদর্শ গোশালা' নির্মাণ করেছিল। এটা অবস্থিত ছিল বাগবাজারে নন্দলাল বসু লেনে। পরে গোশালাটা উঠে যাবার পর, ওই জমিটাই করপোরেশন বার্ষিক এক টাকা প্রদেয় 'লিজ' শর্তে দেয় মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে। ওর টেকনিকাল বিভাগের জন্য। ওখানেই এখন ওই স্কুলটা অবস্থিত।

আমার ছেলেবেলায় শহরের বড় রাস্তাগুলোয় ছিল গ্যাসের আলো। গলিঘুঁজির মধ্যে তখনো তেলের আলো জ্বলত। আর লোকের বসতবাড়িতে মূলত জ্বলত রেড়ির তেলের প্রদীপের আলো। তখন হ্যারিকেন লানটার্ন আমদানী হয়নি। ইলেকট্রিসিটিরও প্রচলন হয়নি। আমরা পড়াশুনা করতাম রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোতে। তখনকার দিনের লেখাপড়ার সাজসরঞ্জামের কথা বললে, এখনকার

ছেলেরা অবাক হয়ে যাবে। ফাউনটেন পেনের তো তখন প্রচলন হয়নি। নিব লাগানো কলমে লিখলেও সেদিন আর অক্ষত দেহে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে হত না। যতক্ষণ না হাতের পাতা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাস্টারমশাইরা বেত্রাঘাত করে যেতেন। বাংলা লিখতে হতো খাগের কলমে, আর ইংরেজি হাঁসের পালকের কলম দিয়ে। এসব আজকালকার দিনে অনেকের কাছেই রূপকথা বলে মনে হবে। দু'ধরনের লিপির জন্য দুই প্রকার কলমের উপযোগিতাও ছিল।

স্কুলের পড়া তৈরি করবার জন্য সে যুগে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর থাকত না। 'প্রাইভেট টিউটর' নামে জীব শুধু বিত্তবান পরিবারেই থাকত। সাধারণ পরিবারের ছেলেরা নিজেরাই পড়া তৈরি করত। পাঠ্য বিষয়ের কিছু বুঝতে না পারলে, বাবা, কাকা বা দাদাদের সাহায্য নিত। প্রাইমারি স্তর থেকেই ইংরেজি পড়ানোর প্রচলন ছিল। ছেলেরা পায়ে হেঁটেই স্কুল কলেজ যেতো। অনেকের পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে হয়ে যেত।

শিক্ষার খরচ খুবই কম ছিল। স্কুলের মাহিনা নীচের ক্লাসে এক-আনা দু-আনা থেকে আরম্ভ করে, উঁচুক্লাসে গিয়ে একটাকা দু-টাকায় শেষ হত। যে কোনও ক্লাসের বই আট-দশ টাকার মধ্যেই কেনা যেত। বছর বছর পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন ঘটত না। তার ফলে দাদাদের বই ছোট ভাইরা ব্যবহার করত।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ইংরেজির কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তবে নেস্‌ফিলডের গ্রামার ও লাহিড়ির 'সিলেকট পোয়েমস্‌' সকল স্কুলেই পড়ানো হত।

আর এক কথা বলি। সেকালে বাড়ির কোন ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন বা এনট্রানস্‌ পরীক্ষায় (আজকালকার স্কুল ফাইনাল) পাশ করলে, পাড়ায় মিষ্টান্ন বিতরণ করা হত।

আজকের মাপকাঠিতে সে যুগের লোকের আয় ছিল খুব কম। ছুতোর মিস্ত্রির রোজ ছিল পাঁচ আনা ছয় আনা। রাজ মিস্ত্রিরও তাই। জন মজুর তিন আনা চার আনা। আফিসের চাপরাশির মাহিনা শুরু হত মাসিক সাত টাকায়, বাবুদের বারো টাকায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নন-গ্রাজুয়েটদের পনর টাকা ও গ্রাজুয়েটদের পঁচিশ টাকা, মাস্টার মশাইদের দশ থেকে পনর টাকা হেডমাস্টারদের পঞ্চাশ টাকা। কলেজের প্রফেসরদের ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। বিলাত থেকে I. C. S. পাশ করে এসে সাহেবরা সরকারী চাকরি শুরু করত ১৫০ টাকায়। দ্বিতীয় বর্ষে ২৫০ টাকা। অবসর গ্রহণের সময় ১২০০ টাকা। ডাক্তারের ফী এক টাকা থেকে চার টাকা। উকিলদেরও তাই। সোনা রূপার গহণা গড়ালে স্যাকরার বানি ছিল দুটাকা থেকে চার টাকা। জমির দাম ছিল হাজার টাকা কাঠা।

কিন্তু আয় কম হলে কি হবে? তাতেই সুখ-সাচ্ছন্দ্য ছিল। তার কারণ জিনিস পত্তরের দাম ছিল খুবই সস্তা। ট্যাঁকে দু-আনা পয়সা নিয়ে লোক বাজার করতে যেত। পারশে, ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি মাছ চার আনা সের। কাটা রুই মাছ ছয় আনা সের। মাংসও ছয় আনা সের। শাক-শবজি, আনাজ-পত্তর এক

পয়সা সের। আলু তিন পয়সা থেকে চার পয়সা। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এক থেকে দু পয়সা সের। হাঁসের ডিম এক পয়সায় একটা। দুধ টাকায় আট সের। মাখন আট আনা সের। ঘি দশ আনা সের। সরিষার তেল দু-আনা দশ পয়সা সের। চিনি দু-আনা সের। চাল দেড় টাকা থেকে দু টাকা মন। আটা তিন পয়সা, ময়দা চার পয়সা সের। সন্দেশ-রসগোল্লা থেকে আরম্ভ করে সব রকমের খাবার ছয় আনা সের। কাপড়-জামা জুতোর দামও ছিল খুব সস্তা। মিলের ফাইন-ধুতি ও শাড়ি দুটাকা জোড়া। উৎকৃষ্ট ধনেখালির শাড়ি তিন টাকা। বাকিংহাম ও কর্ণাটক মিলের শাটিং পাঁচ আনা গজ। নটবর দাসের চটি জুতা এক টাকা। ফ্লেকস্-এর শু জুতা তিন টাকা। হাওড়ার মুংলি হাট থেকে কিনে আনতাম মেয়েদের ওরগাণ্ডির ব্লাউজ এক টাকায় চারটে।

তিন

সেকালে দিন কার্যত ভোর চারটের সময় শুরু হত। কেননা, মেয়েরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা, এবং ভোর চারটের সময়ই তারা বেরিয়ে পড়ত গঙ্গা স্নানে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরত। বাড়ি ফিরেই পূজা-আহ্নিক করে সংসারের কাজে লেগে যেত। মেয়েরা নিজেরাই রান্না করত। রান্নার উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম অন্য রকম ছিল। সে সম্বন্ধে আমি পরে বিশদ বিবরণ দিয়েছি।

সেকালে সারাদিনই ফিরিওয়ালার গতিবিধি ছিল। তবে সেকালের অনেক ফিরিওয়ালার ডাক আজ স্তব্ধ। যেমন 'টাকায় চারখানা কাপড়, এক খানা ফাউ', 'এক পয়সায় চারখানা দেশলাই', 'রাম রাম সিগারেট এক পয়সায় দশটা' 'নাকের নথের আসল মুক্তা লেবে গো' ইত্যাদি। আরো অন্তর্হিত হয়েছে আমার ছেলেবেলার অনেক ফিরিওয়ালার ডাকা; যেমন, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে শুনতাম 'চাই মুড়ির চাক', 'ছোলার চাক', 'চিঁড়ের চাক' বা শীতকালে ভোরবেলা 'চাই খেঁজুর রস', একটু বেলায় 'নলেন গুড়ের পাটালি', 'জয়নগরের মোয়া'।

সকাল থেকে আরো অনেক ফিরিওয়ালা অসত। প্রথম আসত বাংলা কালিওয়ালা। চাল পুড়িয়ে তার ভুষো দিয়ে এই কালি তৈরি করা হত। শহরের সব দোকানদারই এই বাংলা কালি দিয়ে লিখত, খাগের কলমে। তারপর আসত আতর ও ফুলের তেলওয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যেত 'চাই হিং', পর পর আসত ধোপা ও নাপিত। তখন কলকাতায় লন্ড্রি বা সেলুন ছিল না। দুধওয়ালারও আবির্ভাব ঘটত সঙ্গে সঙ্গে। আরো আসত বাড়ি বাড়ি ঠাকুরদের গান করবার জন্য নাম সংকীর্তনের দল।

একটু পরেই শোনা যেত 'তিলকুট, চন্দরপুলি, জিভেগজা' ও 'চাই পাঁপড়', 'শিল কাটাবে গো', 'ধামা বাঁধাবে গো', 'ছুরি, কাঁচি বঁটি শান দেবে গো', 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত', 'লক্ষ্মীর পাঁচালি', 'চাই আমসত্ত্ব', 'ছাতা সারাবে গো', 'রিপুকর্ম করাবে গো', 'কাপড় কাঁচাবে গো', 'শিশি বোতল,

পুরানো কাগজ চাই', 'মাথার চুল বাঁধার ফিতে এক পয়সায় পাঁচ হাত'। সঙ্গে সঙ্গে গরমের দিনে ফলওয়ালা আম, কালোজাম, গোলাপজাম, লিচু, আঙুর, বেদানা, ন্যাসপাতি ইত্যাদি বেচবার জন্য। এর মধ্যেই দেখা দিয়ে যেত তারের বাঁধাওয়ালা ও কাগজের ফুল ও বাঁশিওয়ালা।

মেয়ে ফেরিওয়ালাদের মধ্যে আসত কয়লাওয়ালী এরা মাথায় ঝুড়ি করে কয়লা বেচত, ঘুঁটেওয়ালী, মাটিওয়ালী, এরা সবাই অবাঙালী। বাঙালী মেয়ে ফেরিওয়ালীর মধ্যে ছিল কাঠের বসবার পিঁড়ে, টুল, জলচৌকি ইত্যাদি বিক্রিওয়ালীরা। এদের পুরুষরা বাড়িতে বসে এগুলো তৈরি করত, আর মেয়েরা ফেরি করত।

দুপুরের আগেই আসত মাথায় থলে ভরতি ধনে, সরষে, হলুদ নিয়ে পাইকারি দরে সেগুলো গেরস্তলোকদের বেচবার জন্য।

দুপুরের পরে আসত চুড়িওয়ালীর দল, মেয়েদের হাতে কাঁচের চুড়ি পরাবার জন্য। এরা সবাই উত্তর প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। অনেক বাঙালী মেয়ে ফিরিওয়ালীর ডাকও শোনা যেত! 'দাঁতের পোকা বের করাবে গো', 'বাত সারাবে গো', 'ভানুমতীর খেল, সাপের খেলা দেখবে গো'। আরো আসত বাসনওয়ালীর দল, পুরণো কাপড়ের পরিবর্তে নতুন বাসন দেবার জন্য। আর আসত তাঁতি বউ, বাড়ি বাড়ি তাঁতের কাপড় বেচবার জন্য। কাঁসরের আওয়াজ শুনলেই বুঝা যেত, এবার আসছে কাঁসারবাসনওয়ালা। দুপুরবেলা আরো অনেক ফিরিওয়ালা আসত। মালাই বরফওয়ালা, পাঞ্জা বরফওয়ালা, বুড়ির মাথার পাকাচুল, আলু-কাবলিওয়ালা, ফুচকাওয়ালা। বিকালের দিকে আসত চানাচুরওয়ালা—মস্তবড় এক বারকোষের ওপর চানাচুর সাজানো থাকত। গরম রাখবার জন্য মাঝখানে একটা ছোট হাঁড়িতে কাঠকয়লা জ্বালা থাকত। প্যাকেটে করে চানাচুর তখন বিক্রি হত না।

বিকেল বেলা চ্যাঙারি মাথায় করে গলায় পৈতে ঝুলানো আসত—'চাই পাউরুটি বিস্কুট।' পাউরুটিওয়ালার পরেই আসত কেরোসিন তেলওয়ালা তারা এসে তেল ভরে দিয়ে দরজার মাথার ফ্রেমে দাঁড়ি টেনে দিত। মাস কাবার হলে ওই দাঁড়ির হিসাবে পাওনা কড়ি নিত। সন্ধ্যের মুখে আসত কুলপি বরফওয়ালা, তপসে মাছওয়ালা, ঘুঘনি ও অবাক জলপানওয়ালা, 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা', 'মুড়মুড় ভাজা' ইত্যাদি। রাত্রে আসত বেলফুলের মালাওয়ালা ও 'হীরামতী রাক্ষসী'।

শতাব্দীর সূচনায় কলকাতার হাটবাজারে যে সব মুদ্রার মাধ্যমে কেনাবেচা হত সে সম্বন্ধে কিছু বলি। তিন রকমের মুদ্রার প্রচলন ছিল—খাঁটি তামার, খাঁটি রূপার ও কাগজের। খাঁটি তামার মুদ্রা চার মূল্যমানের ছিল—পাই পয়সা (১২ পাই পয়সায় এক আনা), আধলা পয়সা (দুই আধলা পয়সায় এক পয়সা) পয়সা (৬৪ পয়সায় এক টাকা) এবং ডবল্ পয়সা (টাকার আকারের ও দুই পয়সার সমতুল)। খাঁটি রূপার মুদ্রা চার মূল্যমানের ছিল—দুয়ানি (আট পয়সার সামিল), সিকি (চার আনা বা ১৬ পয়সার সামিল) আধুলি (আট আনা বা বত্রিশ পয়সার সামিল) ও টাকা (১৬ আনা বা ৬৪ পয়সার সামিল)।

এক আনার কোন মুদ্রা ছিল না। প্রথম এক আনার মুদ্রার প্রবর্তন হয় ১৯০৪ সালে। তখন ডবল পয়সা ও দুয়ানি উঠে যায়। ১৯০৪ সালে আরও একটা পরিবর্তন ঘটে। খাঁটি তামার পয়সা উঠে যায়। তার পরিবর্তে তামা ও নিকেল মিশ্রিত পয়সার প্রবর্তন ঘটে। নতুন পয়সাগুলো সোনার মত দেখতে বলে গুজব রটে যে টাকশালে পয়সা তৈরি করবার সময় তামার সঙ্গে সোনা মিশে গেছে। ফলে নতুন পয়সা দু-চার টাকায় বিক্রি হতে লাগল। তারপর যখন মজাটা প্রকাশ পেল, তারা হাত কামড়াতে লাগল।

কাগজের মুদ্রা দুরকমের ছিল—৫ টাকার নোট ও দশ টাকার নোট। নোট-গুলোর সাইজ অনেক বড় ছিল ও মাত্র এক পিঠে ছাপা ছিল। পিছন পিঠটা একদম খালি থাকত। লোক নোটখানাকে দ্বিখণ্ডিত করে, এক খণ্ড ডাক যোগে প্রাপককে পাঠিয়ে দিত। প্রাপকের কাছ থেকে প্রাপ্তি সংবাদ পেলে, অপর খণ্ড পাঠাত। তখন পিছনে কাগজ মেরে নোটটা বাজারে চালু করত। এ রকম জোড়া নোট বাজারে বহুল চালু ছিল। তবে দুখণ্ডের নম্বর একই হওয়া চাই। এক টাকার নোট প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯১৭-১৮ সালে। দুটাকার নোট তার পরে।

চার

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় এসে বাস শুরু করেছিল, তখন তাদের বসতির দক্ষিণে ছিল একটা খাল। সেটাই ছিল তখনকার কলকাতার শেষ গণ্ডি, কেননা খালটার ওপারে ছিল চৌরঙ্গীর ঘোর জঙ্গল। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং যেখানে অবস্থিত, তারই নিকটে ভাগীরথী থেকে খালটা বেরিয়ে হেস্টিংস স্টিটের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে বর্তমান কলকাতা রেজিস্ট্রি অফিসের কাছে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে পূর্বদিকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, সুটারকিন স্ট্রিট, চাঁদনী চকের উত্তর, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ক্রিক রো ধরে শিয়ালদহ-বৌবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করে শেষকালে লবণ হ্রদে গিয়ে পড়ত। খালটা রীতিমতো নাব্য ছিল, কেননা সমসাময়িক বিবরণীতে আমরা পড়ি—'large boats could come up it'। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইতিহাসে এক দুর্দৈব ঘটনা ঘটে। ওই বছর কলকাতা প্রকৃতির এক মহারোষের সম্মুখীন হয়। কলকাতা আক্রান্ত হয় এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়-জলে। পাঠকের মনে থাকতে পারে, আমি এই রচনার শুরুতেই বলেছিলাম যে এই ঝড়েই বাগবাজারের কাছে গোবিন্দরাম মিত্র নির্মিত নবরত্ন মন্দির (মনুমেন্টের থেকেও উচু ছিল) ভেঙে যায়। ওই ঝড়-জলে ওই খালটায় বিনষ্ট হয় বহু বিশালাকায় নৌকা। তাতে ওই খালটার গতিপথ বন্ধ হয়ে যায় ও ধর্মতলার পূর্বাংশের নাম হয় 'ডিঙাভাঙা'। এরপর খালটা বুজিয়ে দেওয়া হয়। ৩৯ ও ৪০ নং লেনিন সরণীর মধ্যে অবস্থিত 'ডিঙাভাঙা লেন' এখনো সেই দুর্ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে তার নামের মধ্যে।

খালটা লবণ হ্রদে যেখানে গিয়ে পড়েছিল, সেখানেই ছিল বৈঠকখানার সেই পৌরাণিক বৃক্ষটি, যার তলায় বলা হয় জোব চার্নক বসে তামাক খেতেন ও

মাল গস্ত করতেন। জায়গাটা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের আপজনের মানচিত্রে দেখানো আছে। জোব ওখানে গিয়ে গাছতলায় বসে কেন তামাক খেলেন, তার কারণটা বলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের পণ্যবাহী নৌকাসমূহ লবণ হ্রদ অতিক্রম করেই কলকাতায় আসত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও সেগুলি তাই করত। ওই সব পণ্যবাহী নৌকাসমূহ কলকাতার ওই প্রাচীন খাল দিয়ে ভাগীরথীতে এসে পড়ত এবং বেতোরের পুর্তুগীজ বণিকদের কাছে তাদের মাল বেচত। ইংরেজরা কলকাতায় আসার পরেও তারা ওই পথেই কলকাতায় আসত। খানিকটা পথ এগিয়ে সস্তায় মাল গস্ত করা যাবে বলেই জোব চার্নক সুতানটি থেকে বৈঠকখানার গাছতলায় বসে তামাক খেতেন ও মাল গস্ত করতেন। আরও একটা কারণ ছিল। কলকাতায় তখন অবৈধ বণিকদের (interloper) আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাছে মাল তাদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেটা রোধ করাও চার্নকের উদ্দেশ্য ছিল।

এর পাঁচ বছর পরে, সম্পূর্ণ অন্য কারণে শহরটাকে বেষ্টিত করে একটা খাল কাটতে হয়েছিল। কারণটা রাজনৈতিক। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বাঙলাদেশে এসে উৎপাত আরম্ভ করে। একেই কুখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়। সমসাময়িক তিনখানা বইয়ে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাই। এ তিনখানা বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ। এখানা ১৬৬৬ শকাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের একখানা পুঁথি আছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে 'বর্গীদের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বাঙলার লোক বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহমহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থ রাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘ সূর্যের অসহনীয় তাপক্লেশ, যথাসময় পানাহার লাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চিৎকারে ব্যথিত জননীগণের আর্তনাদ ও অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত।' আর একখানা গ্রন্থ হচ্ছে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। এখানে রচিত হয়েছিল ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মহারাষ্ট্র পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—

'কারু হাত কাটে—কারু নাক কান।
  একই চোটে কারু বধে পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক যত বইয়া লইয়া জা-এ।
  আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা-এ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
  রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥'

বর্গীর হাঙ্গামাকে লক্ষ করে ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'-এ লিখেছেন—

'লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙাল।
গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥'

সাধারণ লোকের মনে বর্গীর হাঙ্গামা এমন এক উৎকট ভীতি জাগিয়েছিল যে পরবর্তীকালে বাঙলার মেয়েদের মুখে ছেলেদের ঘুম পাড়ানো গানে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। একবার নয়, প্রায় ন'বছর ধরে এই হাঙ্গামা চলেছিল। বর্গীরা ভাগীরথী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ শহরে লুটপাট করে। জগৎ শেঠের বাড়ি থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করে। ইংরেজদের কয়েকটা নৌকাও বর্গীরা লুটপাট করে। কলকাতার লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাঠের রক্ষাবেষ্টনী (১৭২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজরা তাদের অধিকৃত অঞ্চল এক কাঠের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ছিল) থাকা সত্ত্বেও ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা শহর সুরক্ষিত করবার জন্য দেশীয় বণিকদের সহায়তায় শহরের চারদিক ঘিরে 'মারাঠা ডিচ' খুঁড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু এ কাজ সমাপ্ত হবার আগেই বর্গীর উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে খালের বাকি অংশ আর সম্পূর্ণ হয়নি। পরে এই অসম্পূর্ণ খাত নানারকম ব্যাধির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে এটাকে বুজিয়ে সারকুলার রোড (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড) নির্মিত হয়। এটা তখন পুরাতন কলকাতার সাহেব-মেমদের সান্ধ্যভ্রমণের পথ হয়। তারা এর নাম দেয় 'বাহার সড়ক'।

পাঁচ

সাহেবরাই কলকাতা শহরকে গড়ে তুলেছিল। সুতরাং গোড়া থেকেই এটা সাহেবদের শহর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে লালদিঘির পশ্চিমে একটা দুর্গ নির্মাণের পর অনেক সাহেব দুর্গের আশেপাশে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছিল। তার আগে তারা এখনকার চীনাবাজার অঞ্চলে বাস করত। কেননা, ইংরেজরা কলকাতায় আসার আগে তাদের পূর্ববর্তী আগন্তুক পর্তুগীজ ও আরমেনিয়ানরা ওখানেই বাস করতে শুরু করেছিল। চীনা বাজারেই ছিল পর্তুগীজদের একটা গির্জা। সে কারণে উপাসনার জন্য ওখানে বাস করাই ইংরেজদের পক্ষেও সুবিধাজনক ছিল। দুর্গ নির্মাণের পর সাহেবরা যখন দুর্গের আশেপাশে ঘরবাড়ি তৈরি করল, তখন তারাও নিজেদের উপাসনার সুবিধার জন্য বর্তমান মহাকরণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা গির্জা নির্মাণ করে নিল।

আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন বলে গেছেন যে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ১২০০ ইংরেজ বাসিন্দা ছিল। আর লঙ সাহেব বলেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতায় ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ৪০০০। কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। সুতরাং যে সমাজে পুরুষের তুলনায় মেয়েছেলে কম থাকে, সে সমাজে যা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ইংরেজদের যৌন চরিত্রের মান কোনদিনই খুব উঁচু স্তরের ছিল না। অধিকাংশ ইংরেজই তাদের যৌন ক্ষুধা মেটাত এদেশী মেয়েছেলের মাধ্যমে। এদেশের মেয়েরাও সাহেবদের জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকা পছন্দ করত। এসব এদেশী মেয়েছেলেদের 'বিবিজান'

বলা হত। এরকম অসবর্ণ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সাহেবদের কোনো আপত্তি ছিল না। জোব চার্নক থেকে আরম্ভ করে অনেক সাহেবেরই এরকম মানবীয় সম্পর্কের দলিল কবরখানা খুঁজলে পাওয়া যায় এখনো।

মেয়েছেলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বিলাত থেকে ক'জন অবিবাহিতা মেয়ে জাহাজে করে কলকাতায় এল, তার খবর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হত। আগন্তুক মেয়েছেলেদের নিয়ে কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ির ধুম লেগে যেত। সাধারণত এসব মেয়ে কলকাতায় এসে তথাকথিত কোনও 'মাসীমা'র বাড়ি উঠত। সেখানে আইবুড়ো ইংরেজদের ভীড় লেগে যেত, এবং তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য 'পার্টি' দেওয়া হত। অনেক সময় পরিচয় ঘটত গির্জাঘরে প্রার্থনার দিনে। 'শুভস্য শীঘ্রম' বাণীকে সে যুগের ইংরেজরা মনে প্রাণে যত মূল্য দিত সেরকম আর কোনও যুগে দেখা যায় না। সাধারণত আগন্তুক মেয়েদের পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত।

যেসব মেয়েছেলে আসত, তারা ভাগ্যান্বেষীর দল। তারা স্বভাবতই ইংলন্ডের খুব উচু পরিবারের মেয়ে হত না। তারা ইংলন্ডে বসে শুনত, যেসব ইংরেজ কলকাতায় আছে তারা সব এক একজন 'নবাব' বিশেষ। কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল। কেননা, সে যুগের কলকাতায় ইংরেজ বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কোম্পানির কর্মচারী। গোপন ব্যবসা এবং নানারকম অবৈধ উপায়ে তারা প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করত।

মেয়েছেলে নিয়ে সে যুগে সাহেবদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই হত। একে 'ডুয়েল' (duel) বলা হত। শুধু মেয়েছেলে নয় কোনো বিবাদ বিসম্বাদ হলেও, তার মীমাংসা করা হত, 'ডুয়েল'-এর মাধ্যমে। কলকাতার বর্তমান ঘোড়াদৌড়ের মাঠের কাছে দুটো গাছ ছিল। ওই গাছ দুটোকে 'trees of destruction' বলা হত। কেননা ওই গাছ দুটোর তলাতেই হেস্টিংস ও ফ্রানসিস ডুয়েল লড়েছিলেন। অনেকের মতে অবশ্য লড়াইটা হয়েছিল এখনকার জাতীয় গ্রন্থাগারের চৌহদ্দির মধ্যে।

আগেই বলেছি যে গোড়ার দিকে সাহেবপাড়া পুরানো দুর্গের আশেপাশে ছিল। তখনো পর্যন্ত কলকাতার সেই পুরানো খালটা বিদ্যমান ছিল। ভাগীরথীর যেখান থেকে খালটা শুরু হয়েছিল, তারই দক্ষিণে খালটার অপর পারে ছিল শেঠ-বসাকদের আবাদ-ভূমি ও তাঁতশালা। তার পূর্বদিকে ছিল চৌরঙ্গীর বিরাট জঙ্গল। ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই ছিল কালীঘাটে তীর্থযাত্রীদের যাবার পায়ে হাঁটা পথ। জঙ্গলের মধ্যে এখন যেখানে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ি, ওখানে ছিল এক সাধুবাবার আশ্রম ও মন্দির, যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল চেতুয়া-বরদার বিতাড়িতা রানী অজিতাসুন্দরী।

বলেছি, ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ের পর খালটা ভাঙা ডিঙির গাদায় অকেজো হয়ে যাবার পর, ওটা বুঁজিয়ে দেওয়া হয়। খালটা বুঁজিয়ে ফেলবার পর ওর পাশের অঞ্চলেই উঠে আসে কলকাতার ব্যবসাপাড়া ও সাহেবপাড়া। বর্তমান বেংটিঙ্ক স্ট্রিটের তখন নাম দেওয়া হয় কসাইটোলা। এটা বিস্তৃত ছিল লালবাজারের মোড় থেকে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত। কসাইটোলা কলকাতার একটা বড় ব্যবসা কেন্দ্রে

পরিণত হল। খালটা বুঁজিয়ে দেওয়ার ফলে কলকাতা ও চৌরঙ্গী অঞ্চলের মধ্যে আর কোনো বিচ্ছিন্নতা রইল না। এই সময় থেকেই চৌরঙ্গীর জঙ্গলটা পরিষ্কার করা শুরু হয়। সমসাময়িক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, চৌরঙ্গী অঞ্চলে দু-একখানা বাড়িও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ময়দানে নতুন দুর্গও (ফোর্ট উইলিয়াম) নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল। শহর এইভাবে দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়ার ফলে সাহেবপাড়া এগিয়ে গেল চীনাবাজার অঞ্চল থেকে কসাইটোলা পর্যন্ত। কসাইটোলার বড় রাস্তা ছাড়া আশেপাশের অলিগলিগুলোতেও লোক বসবাস শুরু করে দিল। এই সময় ফাঁকা এসপ্ল্যানেড (এসপ্ল্যানেড তখন নতুন দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) সাহেব-মেমেদের বেড়াবার স্থান ছিল। ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আপজনের কলকাতার মানচিত্রে দেখি যে কাউনসিল হাউস স্ট্রিট তখন তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিম দিকে ওরই সমান্তরাল রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল পুরনো বড় পোস্ট অফিস। সেজন্যই ওই রাস্তাটার নাম এখনো 'ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট আছে।' কাউনসিল হাউস স্ট্রিটের শেষে এখন যেখানে ট্রেজারি বিল্ডিং, ওখানেই ছিল গভর্নরের বাড়ি। এক কথায় খালধার আর তখন খালধার ছিল না, হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহেব-সুবো ও গভর্নরের নিবাস স্থল। বর্তমান রাজভবন তৈরি হল ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট মারকুইস অব ওয়েলেসলীর সময়। এর নির্মাণে তাঁর বক্তব্য ছিল—'India should be govemed from a palace and not from a counting house, with the ideas of a prince, not with those of a retail dealer in muslins and indigo.'

কলকাতাকে গড়ে তোলবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হচ্ছিল, তার অধিকাংশ ভাগই তোলা হচ্ছিল লটারি থেকে। লটারির টাকাতেই তৈরি হয়েছিল টাউন হল বিল্ডিং। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'লটারি কমিটি' উঠেপড়ে লাগল চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা নতুন সাহেবপাড়া তৈরি করতে। যে নতুন সাহেবপাড়াটা তৈরি হল সেটা হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে। পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণ অঞ্চলে তখন ছিল এক বিরাট বস্তি। ওটার নাম ছিল 'ডানকান সাহেবের বস্তি' বা 'বামুন বস্তি'। তখন এটা ছিল ক্যামাক সাহেবের সম্পত্তি। 'বামুন বস্তির' দক্ষিণে ছিল বিরজিতলা ও ডিহি বিরজি গ্রাম। (এলগিন রোড ও চক্রবেরিয়া অঞ্চল)। 'লটারি কমিটি' এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে তৈরি করল ক্যামাক স্ট্রিট ও হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, উড স্ট্রিট প্রভৃতি অঞ্চল। এর আগে থেকেই ধর্মতলা, জানবাজার ও পার্ক স্ট্রিটের মধ্যে অনেকগুলো ইংরেজদের বাড়ি ছিল। বামুন বস্তি প্রভৃতি উচ্ছেদের পর এ সমস্ত অঞ্চল পূর্বোক্ত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট ইংরেজ পল্লী সৃষ্টি করল। তখন থেকেই সাহেবরা এই অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে বাস করতে শুরু করল। এখন বাস করে দেশী সাহেবরা।

প্রথম প্রথম যখন বাড়ি তৈরি হল, তখন বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপর যখন ইংরেজদের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন মাপঝোক করে আরো বাড়ি তৈরি হল। চৌরঙ্গীর ওপরই তৈরি হল অনেক বাড়িঘর।

বড় বড় দোকানগুলো সব কসাইটোলা থেকে উঠে এল চৌরঙ্গীতে। কলকাতা তখন সত্যিই প্রাসাদপুরীতে পরিণত হল।

সেকালের কলকাতায় সাহেবদের কোনো হোটেল ছিল না। ছিল সরাইখানা বা ট্যাভার্ন (tavern)। এরূপ কয়েকটি সরাইখানা লালবাজার ও কসাইটোলায় ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত সরাইখানা ছিল 'হারমনিক ট্যাভার্ন'। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এটা কলকাতার উচ্চ ইংরেজ সমাজের একটা মজলিশ গৃহ ছিল। ওই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের এক বিজ্ঞাপনে দেখি যে স্যার এলিজা ইমপের একজন স্টুয়ার্ড কলকাতায় একটা হোটেল খুলবে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জনৈক উইলসন ফলতায় সদ্য-আগত সাহেব ও মেমদের জন্য একটা বড় রকমের থাকবার ও খাবার হোটেল খুলেছিলেন।

কলকাতার সবচেয়ে পুরানো 'হোটেল' হচ্ছে 'স্পেনসেস হোটেল'। এটা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতায় যেসব হোটেল ছিল, সেগুলো হচ্ছে ডেভিড উইলসনের 'অকল্যান্ড হোটেল' (পরে এটাই 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল' নামে অভিহিত হয়); গভর্নমেন্ট প্লেস নর্থ-এ 'বেনিটো হোটেল', রানী মুদির গলিতে (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট) 'বেনটনস হোটেল' ও 'স্পেনসেস হোটেল'।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুকাল স্পেনসেস হোটেলে বাস করেছিলেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই (বিদেশে থাকাকালীন আর্থিক দুর্দশায় ক্লিষ্ট মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সাহায্যে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন) মধুসূদনের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পরে চৌরঙ্গীর ওপর 'গ্র্যান্ড হোটেল' প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

ছয়

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে, তখন কলকাতার বড়লোক বলতে শেঠ বসাক ও সাবর্ণ চৌধুরিদের বুঝাত। সাবর্ণ চৌধুরিরা কলকাতার জমিদার হলেও, পয়সার মাপকাঠিতে শেঠ বসাকরাই ছিল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শীঘ্রই কলকাতায় বড়লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এঁরা এদেশের বনেদী পরিবারের বংশধর নন। এঁরা ভাগ্যান্বেষীর দল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে, এঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এবং কলকাতার অভিজাত বংশসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হন। প্রথম যাঁর কথা আমরা শুনি তিনি হচ্ছেন পঞ্চানন কুশারী। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ইনি জাহাজ থেকে মাল ওঠানো-নামানোর কাজে নিযুক্ত হন। বামুন বলে লোকে তাকে 'ঠাকুরমশাই' বলে ডাকত। জাহাজের ক্যাপটেনরাও তাঁকে ওই নামে অভিহিত করত। সেই থেকেই তাঁর উপাধি 'ঠাকুর' হয়েছিল। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ঠাকুর ১৭০৪-০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালেক্টর বেনজামিন বাউচার সাহেবের কলকতা জরিপের সময় তাঁর অধীনে আমিনের কাজ করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। জয়রামের পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর

(১৭৩১-১৭৯৩) প্রথমে ফরাসী কোম্পানি ও পরে ইংরেজদের অধীনে কাজ করে এবং পরে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে অনেক ধন অর্জন করেন। তিনিই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই অগ্রজ নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ। নীলমণিও দেওয়ানী পদে নিযুক্ত থেকে অঢেল অর্থ উপার্জন করেন।

বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যারা অর্থ উপার্জন করে কলকাতার অভিজাত বংশ সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারা হয় ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, আর তা নয়তো তাদের দেওয়ানী বা বেনিয়ানী করত। দেওয়ানী ছিল চাকরি বা গোলামি করা। মনিবের হয়ে তারা মনিবের ব্যবসা (প্রধানত লবণ ও আফিমের ব্যবসা) দেখত জমিদারির তদারকি করত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্য কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করত। এক কথায়, দেওয়ানরাই ছিল মনিবের কর্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ হর্তাকর্তা বিধাতা। দেওয়ানদের অর্থ প্রাচুর্যের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় যে তারা চুরি-চামারি করে মনিবের টাকা রীতিমত ফাঁক করে দিত। আর বেনিয়ানী ছিল, যাকে বলে মহাজনী কারবার। এরা বন্ড লিখিয়ে নিয়ে সাহেবসুবোদের টাকা ধার দিত। বিলাসিতার জন্য সাহেবদের প্রায়ই টাকার দরকার হত, এবং সে সময় তারা বেনিয়ানদের শরণাপন্ন হত। ব্যবসার জন্য মূলধন নিয়োগই হোক আর পণ্যদ্রব্য কেনাবেচার কারণেই হোক, সাহেবদের পদে পদে বেনিয়ানদের ওপর নির্ভর করতে হত। টাকা ধার দেবার জন্য বেনিয়ানদের মাঝে মাঝে মার খেতেও হত। কিন্তু অধিকংশ ক্ষেত্রেই ধার দেওয়া টাকার অঙ্কটা সুদে-আসলে এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠত যে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই বড়লোক হয়ে উঠত। এরাই কলকাতা শহরের বনিয়াদী পরিবার সমূহের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়। ধনের গরিমা প্রদর্শন করাই এদের বৈশিষ্ট্য ছিল। পূজাপার্বণও এদের কাছে ধনগরিমা প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। এক একজন তো ছেলেমেয়ের বিয়েতে বা বাপমায়ের শ্রাদ্ধে তখনকার দিনে দু-লক্ষ টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করত। এদেরই দ্বিতীয় পুরুষ কলকাতায় 'বাবুসমাজ' সৃষ্টি করেছিল।

এভাবে যাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র, বনমালী সরকার, রতন সরকার, নকু ধর, শোভারাম বসাক, গোকুলচন্দ্র মিত্র, চোরবাগানের মল্লিক পরিবার। সিন্দুরিয়াপট্টির (বা পাথুরিয়াঘাটার) মল্লিক পরিবার, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, বিশ্বনাথ মতিলাল, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ ঘোষাল, রাজা রাজবল্লভ, বারাণসী ঘোষ, মদনমোহন দত্ত, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণরাম বসু, গৌরী সেন, রামদুলাল সরকার, হরি ঘোষ প্রমুখ।

এদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের আগেকার লোক হচ্ছে গোবিন্দরাম মিত্র, বনমালী সরকার, রতন সরকার, শোভারাম বসাক ও নকু ধর। গোবিন্দরাম হচ্ছেন কলকাতার সহকারী কালেক্টর ও কুমারটুলির মিত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই তৈরি নবরত্ন মন্দির সে যুগের কলকাতার এক দিকচিহ্ন ছিল। সেকথা আগে বলেছি। নন্দনবাগানে

তাঁর এক মনোরম বাগান ছিল। বনমালী সরকার ইংরেজদের ডেপুটি ট্রেডার ছিল। কুমারটুলিতে তার বসতবাড়ি সে যুগের কলকাতার এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। রতন সরকার বা রতু সরকারের অপবাদ ছিল যে তিনি ইংরেজদের মেয়ে মানুষ সরবরাহ করেই পয়সা করেছিলেন। নকু ধর বা লক্ষ্মীকান্ত ধর পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। শোভারাম বসাক ইংরেজদের সঙ্গে সূতা ও বস্ত্রের কারবার করে কোটিপতি হয়। জগন্নাথ ঘাটে তাঁর বসতবাড়ির পশ্চিমে এক মন্দির তৈরি করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গোকুলচন্দ্র মিত্রও পলাশী যুদ্ধের পূর্বেকার বড়লোক, তার সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। এই সময় কলকাতায় বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিল দুই মল্লিক পরিবার। পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবারের নয়নচাঁদ মল্লিকের পুত্র নিমাইচরণ মল্লিক (১৭৩৬-১৮০৮)। কলকাতার সমাজে একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমনকি মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ অপেক্ষাও ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশবিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিক আর এক মল্লিক বংশের লোক। এই বংশের জয়রাম মল্লিক বর্গীর হাঙ্গামার সময় গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি নতুন দুর্গ নির্মাণের সময় ভিটাচ্যুত হয়ে চোরবাগানে এসে বাস করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা বিপুল অর্থ অর্জন করেন। জয়রামের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এই রাজেন্দ্র মল্লিক। রাজেন্দ্র মল্লিক ইংরেজি, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতায় আগত দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য তিনি অন্নসত্র খুলে সাহায্য করেন। তিনি কলকাতার চিড়িয়াখানায় বহু পশুপক্ষী দান করেছিলেন এবং নিজ বাড়িতেও একটা চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিলেন। সে চিড়িয়াখানা বোধহয় এখনো আছে। চোরবাগানে তাঁর মর্মরপ্রস্তর নির্মিত প্রাসাদে (মারবেল প্যালেস) বহু প্রস্তর নির্মিত মূর্তি ও তৈলচিত্র আছে।

আর পলাশী যুদ্ধের পর যাঁরা চাঞ্চল্যকরভাবে বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। সিরাজকে নবাবের পদ থেকে অপসারণ করবার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলেছিল, তার লেখাপড়া তিনিই করেছিলেন। সিরাজের মৃত্যুর পর তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার থেকে নবকৃষ্ণ, মীরজাফর, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায় বহু কোটি টাকার ধনরত্ন পায়। ক্লাইভের চেষ্টায় নবকৃষ্ণ 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি পান। পরে কোম্পানির রাজনৈতিক বেনিয়ান ও সুতানটির তালুকদারি পান। সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনিই দুর্গাপূজায় বাইজির নাচ ও আমন্ত্রিত সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পূজাবাড়িতে নিষিদ্ধ খানা ও সুরাপানের ব্যবস্থা করেন। তার এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের কেউ কিছু যাতে না বলতে পারে, তার জন্য বড় বড় পণ্ডিতদের তিনি কলকাতায় এনে তাঁদের দিয়ে টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করান। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মহারাজ রাজবল্লভ। তাঁরই

অধীনে সরকারি দেওয়ান ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। ওয়ারেন হেস্টিং-এর গুপ্ত চক্রান্ত সমূহের তিনি সহায়ক ছিলেন। তিনিই পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 'লালাবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

হেস্টিংস-এর দৌলতে আর যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তবাবু। হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত ব্যবসার মুৎসুদ্দি হয়ে তাঁর সকলরকম দুষ্কর্মের তিনি সহায়ক হন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস গভর্নর হলে তিনি বহু জমিদারি উপহার পান। কাশীর রাজা চৈত সিং-এর ওপর আক্রমণে কান্তবাবু প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন, এবং পুরস্কার স্বরূপ লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিছু অংশ পান।

অগাধ ধনের মালিক হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্যাতি ছিল গৌরী সেন-এর। সামান্য অবস্থা থেকে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। দেনাগ্রস্ত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। সে কারণে বাঙলাদেশে প্রবাদের সৃষ্টি হয়—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' তাঁর পুরো নাম ছিল গৌরীশঙ্কর সেন।

দেওয়ান হরি ঘোষের নাম থেকেই 'হরি ঘোষের গোয়াল' প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর বাড়িতে বহু ছাত্র থাকা ও খাওয়াদাওয়ার সুবিধা পেত। হরি ঘোষের একটা মস্ত বড় বৈঠকখানা ছিল। সেখানে খোসগল্পের আসর বসত। শত শত নিষ্কর্মা লোক সুযোগ বুঝে সেখানে আড্ডা দিত ও সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করত। তা থেকেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে।

সমসাময়িককালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করে যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূকৈলাশের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল। কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজে ঘোষালদের ছিল অসাধারণ প্রতিপত্তি। এই প্রতিপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল বালাখানার চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময়। চূড়ামণির ছেলের ছিল এক যবনী রক্ষিতা। সেজন্য শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে ঘোষণা করা হয় যে যদি কোনও ব্রাহ্মণ ওই শ্রাদ্ধে যোগদান করে, তাকে পতিত করা হবে। কিন্তু ভূকৈলাশের জয়নারায়ণের অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণরা ওই শ্রাদ্ধে যোগদান করে। শ্রাদ্ধ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্যমতে ব্রাহ্মণেরা বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরিদের সন্তোষ রায়ের মধ্যস্থতাতেই চূড়ামণির শ্রাদ্ধে যোগদান করেছিল এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনও দক্ষিণা গ্রহণ করেননি। টাকাটা সন্তোষ রায়ের হাতে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই টাকা দিয়ে বর্তমান কালীঘাটের নতুন মন্দির তৈরি করা হয় (১৮১০)

সাত

আগেকার দিনে ব্যাঙ্ক ও আয়কর ছিল না। সেজন্য বড়লোকরা যা টাকা উপার্জন করত, তা সিন্দুক বন্দী হয়ে যেত। তাদের দ্বিতীয় পুরুষ সেই বিপুল অর্থের মালিক হয়ে বিলাসময় ও বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা শুরু করে। তারা যে জীবনযাত্রার

উদ্বোধন করে, তাকেই 'বাবু কালচার' বলা হয়। বাবু কালচারটা কী, এবং এই কালচারের নায়কদের কী কী লক্ষণ ছিল তার এক অনুপম বর্ণনা দিয়ে গেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বাবু সমাজ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'তাঁহারা পারসী ও স্বল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া ভোগে সুখে দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিছু বর্ণনা করিব? মুখে ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্র কোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমারেখা। শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালো-পেড়ে ধুতি। অঙ্গে অতি উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে ছুনট্ করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চীনাবাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা ইত্যাদি বাজাইয়া, কবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া আসিত।'

আগেই বলেছি যে কলকাতার সদ্যোজাত বড়লোকেরা তাদের ভ্রষ্টাচারিতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান সমাজের তরফ থেকে প্রতিকূলতা রোধ করবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতদের এনে তাদের দিয়ে টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজনের সময় তারা স্বপক্ষে বিধান পায়। এসব পণ্ডিত নতুন বিধান তৈরি করলেন। নিষ্ঠাবান সমাজের কুলীনদের যেমন নয় লক্ষণ আছে, বাবু সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য তারা বললেন যে শ্রেষ্ঠ বাবুরও নয় লক্ষণ থাকা চাই। যথা 'ঘুড়ি ভুড়ি যশ দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টায়ে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' এক চতুষ্পাঠীর এক অধ্যাপকের বিধানের একটা নিদর্শন ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পন'-এ ছাপা হয়েছিল। 'বাবু জিজ্ঞাসা করেন—ভট্টাচার্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়? উত্তর: ইহাতে পাপ হয় যে বলে, তাহার পাপ হয়। ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস দিলেন, পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বাবু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্যকে টোল করিয়া দিলেন।' ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' বইয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'এক বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে যে পরদার ও যবনী বেশ্যা সম্ভোগে ও সুরাপানে পাপ হয়। কুল-পুরোহিত মহাশয় তাহাকে নির্বোধ বলে গালি দিয়ে বলছেন—'আগত্য ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ্য দ্বিজোত্তমা। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে মাতৃযোনী পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্বযোনিষু' ইত্যাদি। অনুবাদ নিষ্প্রোয়োজন।

উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত বাবুসমাজ ও তার কালচারের প্রতিপত্তি যে পুরামাত্রায় কলকাতায় ছিল, তা আমরা জানতে পারি 'হুতোম পেঁচার নকশা' থেকে। হুতোম এই বাবুদের সম্বন্ধে লিখেছে—"বেশ্যাবাজিটা আজকাল এ শহরে বড় মানুষের এলবাস পোশাকের মধ্যে গণ্য। কলকাতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজারাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না, বাড়ির

প্রধান আমলা দাওয়ান মুচ্ছুদিরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয়কর্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণেরও ভারও তাদের ওপর আইন মতো অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন?··· ছোকরাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান। চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে। স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন।··· বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে বাস করবার জো নেই; তা হলে দশদিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে··· শহরের বড় মানুষেরা অনেকেই এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিতা মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নী, ভাগ্নী ও বাড়ির যুবতী মাত্রই তার ভোগে লাগে··· অনেক বড় মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণ হত্যা হয়।"

তবে বাবু কালচারের শ্রীঘ্রই পতন ঘটেছিল। এর সহায়ক ছিল শিক্ষার বিস্তার। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পঞ্চাশ বছরের ওপর এটা পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা ছিল। ১৯০৯ সালে প্রথম ল কলেজ স্থাপিত হয়। অন্যান্য বিভাগগুলো ১৯১৮ সাল থেকে শুরু হয়। নতুন সমাজের ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ এটর্নি, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আর কেউ কেরানী হয়েছিল। তার মানে বাবু সমাজকে পশ্চাদপটে হটিয়ে দিয়েছিল একটা শিক্ষিত পেশাদারী সমাজ। এই সমাজই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, রাজনীতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরি করেছিল। এদেশে বিত্ত ও বিদ্যার সমন্বয় এরাই ঘটিয়েছে। দেশের উন্নতি বরাবর এদের ওপরই নির্ভর করেছে। এরাই শেষ পর্যন্ত সাধিত করেছিল এদেশে থেকে ইংরেজের মহাপ্রস্থান।

আট

কলকাতা কালীরই শহর। তার মানে কালীই হচ্ছে কলকতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সে জন্যই উত্তর ভারতের লোকদের কাছে 'কালী কলকাত্তেওয়ালী'। কালীঘাটের কালীই হচ্ছে কলকাতার আদি কালী। অবশ্য, কালীঘাটের কালী কতদিনের পুরানো তা আমাদের জানা নেই। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে যে এর অস্তিত্ব ছিল, তা দুটো সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি। প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা পড়ি—

'ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতোরেতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডীর পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্তগ্রাম থানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।

রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলেন বেয়ে যাই মাইনগর॥

দ্বিতীয়ত, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা তোদরমল সমস্ত বঙ্গদেশ জরীপ করে 'ওয়াশিল-ই-জমা তুমার' নামক এক তালিকা প্রস্তুত করেন। আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২) তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই তালিকাটা নিবন্ধ করেন। এই তালিকায় কলকাতার উল্লেখ আছে।

মনে হয় কালীঘাটের কালীমাতা প্রথমে এক চালা ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের সন্তোষ রায় বর্তমান মন্দির তৈরি করে দেন। মন্দিরটি ৭৫ ফুট চতুষ্কোণ আয়তন বিশিষ্ট এক পাদপীঠের ওপর দণ্ডায়মান এবং উচ্চতায় ৯০ ফুট। দক্ষিণ দিকে এক প্রশস্ত নাটমন্দির আছে।

যেখানে কালী, সেখানেই শিব। সে জন্য প্রতি পীঠস্থানেই শক্তি মন্দিরের কাছে একটি করে শিব বা ভৈরবের মন্দির থাকে। কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর। নকুলেশ্বরের বর্তমান মন্দির ১৮৫৪ সালে তারা সিং নামে এক পাঞ্জাবী তৈরি করে দেন। এককালে এখানে মহাসমারোহে গাজন উৎসব হত। ফ্যানী পার্কস (১৮২০) বলে গেছেন যে শহরের বেশ্যারা কেরাঞ্চি গাড়ি করে এই উৎসব দেখতে যেত।

আগেই বলেছি, কলকাতার আর এক পুরানো কালীমন্দির ছিল কলেকটর সাহেবের সহকারী গোবিন্দরাম মিত্রের কুমোরটুলির 'নবরত্ন মন্দির'। উচ্চতায় এই মন্দির ছিল ১৬৫ ফুট, শহীদ মিনারের চেয়েও ১৩ ফুট বেশি উঁচু। এই মন্দিরটা কলকাতার দিকচিহ্ন ছিল, এবং গঙ্গাবক্ষে জাহাজের নাবিকরা এটাকে 'প্যাগোডা' বলে অভিহিত করত। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে এর শিখরের খানিকটা পড়ে যায়। সেটা মেরামত করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে মন্দিরটাই ধ্বসে পড়ে যায়। বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের বিপরীত দিকে একটা জোড়-বাংলা মন্দির ছিল। লোকে এটাকে 'ডাকাতে কালীমন্দির' বলত। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে এই মন্দিরটাও পড়ে যায়।

তবে পুরানো কলকাতার অনেক কালীমন্দির এখনো বিদ্যমান আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির, বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দির, ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বৌবাজারের ফিরিঙ্গী কালীর মন্দির ইত্যাদি। যদিও খাস কলকাতার মধ্যে অবস্থিত নয়, তা হলেও চিত্তেশ্বরী কালীর উল্লেখও এখানে প্রয়োজন।

বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে। পুরানো মূর্তিটি পাথরের ছিল। সেটা এখন মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত। কিন্তু বর্তমান

মূর্তি মাটির তৈরি ও উচ্চতায় ৭ ফুট। পুরানো মন্দিরটা আগে গঙ্গার ধারে ছিল। বর্তমান মন্দিরটি দালান রীতিতে গঠিত ও অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল। কালীর দু'পাশে দু'টি শিবলিঙ্গ আছে।

নিমতলার আনন্দময়ীকে শ্মশান কালী বলা হয়, কেননা এক সময় ওটা শ্মশানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে এক মোহন্ত এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই মোহন্ত তাঁর মৃত্যুর সময় দেবী মূর্তিটি জগন্নাথ নামে এক শিষ্যকে দিয়ে যান। তারপর পাঁচ হাত ঘুরে নিমতলা স্ট্রিটের জমিদার মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের হাতে আসে। মা আনন্দময়ীর মূর্তি শবের ওপর আরূঢ় ও কালো পাথরের তৈরি। উচ্চতায় দু'ফুট। যে শ্মশানের মধ্যে মা আনন্দময়ীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আগে তা গঙ্গার একেবারে ধারে ছিল। তারপর গঙ্গায় চড়া পড়বার পর যখন ষ্ট্রান্ড রোড তৈরি হয় তখন মন্দির শ্মশান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চিত্তেশ্বরী মন্দির গান ফাউন্ডারী রোড-এ অবস্থিত। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয় বলে মন্দিরটির মাথায় লেখা আছে। পূর্বে ডাকাতরা চিত্তেশ্বরী আরাধনা করে তবে ডাকাতি করতে বেরুত। ডাকাতদের এক সরদারের নাম ছিল চিতে। জনশ্রুতি তার নাম থেকেই চিত্তেশ্বেরী নামের উদ্ভব। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ নামে এক ব্যক্তি চিত্তেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই চিত্তেশ্বরীর নাম থেকেই চিৎপুর নামের উৎপত্তি।

ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী উদয়নারায়ণ নামে এক ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দিরের গায়ে ১২১০ সাল লিখিত আছে। ইংরেজি হিসাব অনুযায়ী এ তারিখ দাঁড়ায় ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দ। অনেকে এটাকেই মন্দির নির্মাণের তারিখ ধরে নিয়েছেন। বাংলা সন ১২১০ সালে ঠনঠনিয়ার শঙ্করচন্দ্র ঘোষ (যার নাম থেকে শঙ্কর ঘোষ লেন) দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেন।

২৪৪ নং বৌবাজার স্ট্রিটে (এখন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট) ফিরিঙ্গী কালীর মন্দির অবস্থিত। এখানেও কালী মন্দিরের গায়ে একটা শিবমন্দির আছে। এই কালীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। এক জনশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীমন্ত নামে এক ডোম এই কালী প্রতিষ্ঠা করে। সে নিজেই এর পূজারী ছিল। এই ডোম বসন্তের চিকিৎসা করত এবং স্থানীয় বসন্ত রোগাক্রান্ত ফিরিঙ্গীরা শ্রীমন্তের শরণাপন্ন হত, এবং নিরাময় হলে দেবীর পূজা দিত। সে জন্যই এর নাম ফিরিঙ্গী কালী। অপর জনশ্রুতি অনুযায়ী কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গী এই কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সেজন্যই এর নাম ফিরিঙ্গী কালী। বর্তমান সেবাইতরা ব্রাহ্মণ।

উত্তর কলকাতায় আরও অনেক কালী মন্দির আছে। যথা (১) বরানগরে জয় মিত্রের কালী মন্দির। (২) বাগবাজারে চিৎপুর খালের পুলের কাছে ব্যোমকালীর মন্দির। (৩) বাগবাজার স্ট্রিটের শেষে বাগবাজারের কালী। (৪) শ্যামবাজার বাজারের গায়ে জয়কালীর মন্দির। (৫) শ্যামপুকুর থানার পশ্চিমে কম্বুলিয়াটোলার কালী। (৬) চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে লাল মন্দিরের কালী ইত্যাদি।

কালীমন্দিরের মতো কলকাতায় শিবমন্দিরেরও ছড়াছড়ি। মনে হয় কলকাতার

সবচেয়ে প্রাচীন শিবমন্দির নন্দরাম সেনের (কলকাতার প্রথম কালেক্টর র‍্যালফ শেলডনের সহকরী) তৈরি। অনেকের মতে এই কৃতিত্ব বনমালী সরকারের (ইংরেজদের ডেপুটি ট্রেডার)। প্রথমটি নন্দরাম সেনের স্ট্রিটে অবস্থিত। আর দ্বিতীয়টার কোনও হদিশ নেই। যদিও কুমোরটুলিতে একটা জীর্ণ ভাঙা মন্দিরকে বনমালী সরকারের মন্দির বলা হয়।

কলকাতার শিবমন্দির সমূহের মধ্যে বৌবাজারে কেণ্ডারডাইন লেনে অবস্থিত কলকাতা দুর্গের দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশী স্থাপিত মন্দিরগুলিও খুব প্রাচীন। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে নবরত্ন ও আর দুটি পঞ্চরত্ন। কলকাতার নতুন দূর্গ নির্মাণের সময় যেসব মালমশলা ব্যবহৃত হয়েছিল, এই মন্দিরগুলি সেই সেই মালমশলা দিয়ে তৈরি। তবে কলকাতায় অন্যান্য যেসব শিবমন্দির আছে, সেগুলি বাংলার চিরাচরিত আটচালা রীতিতে গঠিত। সেসব শিবমন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাটখোলার মদন দত্তের দুই পুত্র প্রতিষ্ঠিত দুর্গেশ্বর শিবমন্দির, বাগমারীর শিবমন্দির, নন্দরাম সেনের শিবমন্দির (আগে দেখুন), ঠনঠনিয়ার শিবমন্দির, শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রিটের শিবমন্দির, সীতরাম ঘোষ ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ের শিবমন্দির, বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ের শিবমন্দির, দক্ষিণ কলকাতায় বাওয়ালীর মণ্ডলদের নির্মিত শিবমন্দিরসমূহ, টালিগঞ্জ স্টুডিওর কাছে সীতারাম ঘোষ ও বাবুরাম ঘোষ নির্মিত এগারোটি শিবমন্দির, আদিগঙ্গার পশ্চিমে সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত মা করুণাময়ী কালীমন্দিরের সংলগ্ন ১২টি শিবমন্দির, ভূকৈলাশের শিবগঙ্গা জলাধারের পার্শ্বস্থ দুটো শিবমন্দির ও বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখুজ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।

এছাড়া বৈষ্ণবদেরও ভাল মন্দির আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাওয়ালীর উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধামোহনের মন্দির, বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ, রামকান্ত বোস স্ট্রিটের নববৃন্দাবন মন্দির, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের গোবিন্দজীর মন্দির ও মদনমোহন তলার মদনমোহনের মন্দির।

নয়

রোমনগরী যেমন একদিনে তৈরি হয়নি, মহানগরীতে পরিণত হতে কলকাতারও ৩০০ বছরের ওপর সময় লেগেছে। গোড়ার দিকে খুব বিক্ষিপ্তভাবেই শহরের ঘরবাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল। সেজন্য কলকাতায় সুসংহত কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। গোড়ায় তো মাত্র দুটো রাস্তা ছিল—চিৎপুরের রাস্তা ও লালবাজার থেকে বৈঠকখানায় যাবার রাস্তা। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় যখন শেঠ-বসাকরা বি-বা-দী বাগ থেকে বড়বাজারে উঠে যায়, তখন পুরানো কেল্লা (যা এখনকার G. P. O-র পাশে ছিল) থেকে বড়বাজার পর্যন্ত একটা রাস্তা হয়। এটাই ক্লাইভ স্ট্রিট। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এর নামকরণ করা হয় নেতাজী সুভাষ রোড।

পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা যখন ইংরেজদের শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠে, তখন তারা রাস্তাঘাট তৈরির দিকে মনোযোগ দেয়। এ কাজে কলকাতার বড়লোক

বাঙালীরা সহায়তা করেছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। পাথুরিয়াঘাটার নয়নচাঁদ মল্লিক তৈরি করে দিয়েছিলেন ক্রস স্ট্রিট (এখন নাম যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট)। তারপর কলকাতাকে গঠন করে 'লটারি কমিটি', কলকাতা করপোরেশন, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, সি. এম. ডি-এ এবং পি. ডব্লু. ডি। এর মধ্যে লটারি কমিটি (১৮২০-৪০) ব্যাপারিটোলা (ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চল), হেস্টিংস স্ট্রিট, হেয়ার স্ট্রিট, ম্যাঙ্গো লেন, কসাইটোলা, ক্রিক রো, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট, উড স্ট্রিট, ইলিয়ট রোড, পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গী অঞ্চল গঠন করে। এরা ধর্মতলা ও ওয়েলিংটনের সংযোগস্থলে একটা পুষ্করিণী ও স্কোয়ার তৈরি করেছিল। ডিঙাভাঙার খালটা ভরাট করে ক্রিক রো তৈরি করে সার্কুলার রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল এবং (প্রথম নাম হয়েছিল ডিঙাভাঙা স্ট্রিট, পরে ক্রিক রো), ধর্মতলা স্ট্রিট বিস্তৃত করেছিল। এরা ওয়েলিংটনের মোড় থেকে ময়রা স্কোয়ার পর্যন্ত একটা সোজা রাস্তা করে'ছিল। ময়রা স্কোয়ার থেকে বৌবাজার পর্যন্ত আর একটা সোজা রাস্তা করলো। ডিঙাভাঙার উত্তরে মলঙ্গাতে সরু রাস্তাটা চওড়া করেছিল এরাই। তাছাড়া এরা ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট ও চার্চ লেন প্রভৃতির উন্নয়ন করেছিল ও সাহেবপাড়ায় উড স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট ও থিয়েটার রোড তৈরি করেছিল।

সাহেবপাড়ার উন্নয়নের কাজ শেষ হলে এই 'লটারি কমিটি' গোলদিঘি, মির্জাপুর অঞ্চলের উন্নয়ন আরম্ভ করে। ময়রা স্কোয়ার থেকে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত যে সোজা রাস্তাটা তৈরি করেছিল, সে রাস্তাটাকে সোজা টেনে এনে (কলেজ স্ট্রিট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট) শ্যামবাজারের চানকের (বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড) রাস্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯১২ সালে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠিত হবার পর আর জি কর রোড বিস্তৃত করা হয়েছিল। পুরনো পল্লীসমূহ উচ্ছেদ করে উত্তর দক্ষিণে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, বি. কে. পাল অ্যাভেন্যু, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, মিশন রো এক্সটেনসন, ব্রাবোর্ন রোড, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, সাদার্ন অ্যাভেন্যু ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহ তৈরি করা হয়।

আগেই বলেছি যে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল এলোমেলোভাবে। প্রথম দিকে ছিল তার অবিন্যস্ত রূপ। বড় রাস্তার ধারে এক সারি বাড়ির পেছনে তৈরি হয়েছিল আরেক সারি বাড়ি। দু সারি বাড়ির মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছিল এক একটা সরু গলি। এরকমভাবে সারির পর সারি বাড়ি তৈরি হয়েছিল। সেগুলোর সঙ্গে গজিয়ে উঠেছিল অসংখ্য গলিঘুঁজি, আর তাদের বিচিত্র নাম। নামগুলিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পরে। যথা—

(ক) বাজারের নাম থেকে উদ্ভুত, যেমন বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, মেছুয়াবাজার, বৌবাজার, টেরেটি বাজার, রাধাবাজার, চীনাবাজার, জানবাজার ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি রাস্তা সম্ভ্রান্ত লোকের নাম বহন করে। যথা—ক্লাইভ স্ট্রিট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড, গ্রে স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিট, চৌরঙ্গী রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, লায়ন্স রেঞ্জ, হেয়ার

স্ট্রিট, হেসটিংস স্ট্রিট ইত্যাদি। পরে জহরলাল নেহরু রোড, সূর্য সেন স্ট্রিট ইত্যাদি।

(গ) কতকগুলি রাস্তার নাম জাতি বা পদবী বা বৃত্তি বাচক। যথা—আহিরিটোলা স্ট্রিট, কলুটোলা স্ট্রিট, কুমারটুলি স্ট্রিট, আহিরিপুকুর রোড, উড়িয়াপাড়া লেন, কপালিটোলা রোড, কপালিবাগান লেন, কসাইপাড়া লেন, কাঁসারিপাড়া রোড, কামারডাঙ্গা রোড, কুণ্ডু লেন, কুমারপাড়া লেন, খালাসীতলা রোড, গোঁসাই লেন, গোপ লেন, গোয়াবাগান লেন, গোয়ালটুলি লেন, জেলিয়াপাড়া লেন, তাঁতিবাগান রোড, দর্জিপাড়া লেন, নাথের বাগান স্ট্রিট, পটুয়াটোলা লেন, পার্শিবাগান লেন, প্রামাণিক ঘাট রোড, বেদিয়াডাঙ্গা রোড, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, বেনিয়াপুকুর রোড, বেপারিটোলা লেন, ব্রাহ্মণপাড়া লেন, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট ও লেন, যোগীপাড়া মেন রোড, শাঁখারীটোলা স্ট্রিট, শেঠপুকুর, শেঠবাগান লেন, সৎচাষীপাড়া রোড, সাঁতরাপাড়া লেন, সিকদার পাড়া লেন, সিকদারবাগান স্ট্রিট, স্যাকরাপাড়া লেন, হালদারবাগান লেন, ছুতোরপাড়া লেন ইত্যাদি।

(ঘ) কতকগুলি রাস্তা উদ্যান বা অঞ্চল বা ফুল, ফলের নাম বা কোনো বড় বৃক্ষের নাম বহন করছে—যথা ইডেন গার্ডেন রোড, একডালিয়া রোড, কলাবাগান লেন, কেয়াতলা রোড, ক্যাসুরিনা এভেন্যু, চাঁপাতলা লেন, ঝাউতলা রোড, ডালিমতলা লেন, দেওদার স্ট্রিট, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, নিউ কাশিয়াবাগান লেন, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, পানবাগান লেন, পাম এভেন্যু, ফার্ন রোড, ফুলবাগান রোড, বকুলতলা রোড, বকুলতলা লেন, বাঁশতলা গলি, বালিগঞ্জ গার্ডেন, তালতলা স্ট্রিট, বেলগাছিয়া রোড, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন লেন, শীলস্ গার্ডেন লেন, সবজিবাগান লেন, আমড়াতলা লেন, মথুর সেন গার্ডেন লেন, সিংহিবাগান লেন, মোহন বাগান লেন, নন্দনবাগান লেন, হোগলকুড়িয়া, সিমুলিয়া ইত্যাদি।

(ঙ) কতকগুলি রাস্তার নাম ঠাকুরদেবতা বা সাধুসন্ত বা দেবায়তনের নাম সংশ্লিষ্ট। যথা—ওলাইচণ্ডী রোড, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কালী টেম্পল লেন, কালীঘাট রোড, গুরুনানক সরণি, ঘোর বিবি লেন, গৌরাঙ্গ মন্দির রোড, গ্রিক চার্চ রো, ক্যাথিড্রাল রোড, চণ্ডীতলা লেন, চৌরঙ্গী রোড, চ্যাপেল রোড, জগন্নাথ টেম্পল রোড, ধর্মতলা স্ট্রিট, পঞ্চাননতলা রোড, পার্শি চার্চ স্ট্রিট, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, মনসাতলা স্ট্রিট, শীতলা লেন, ষষ্ঠীতলা রোড, সর্বমঙ্গলা লেন, চিৎপুর রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড, হনুমানজি লেন, হরিসভা স্ট্রিট, ব্রাহ্মসমাজ রোড ইত্যাদি।

(চ) কতকগুলি রাস্তার নাম মিস্ত্রি, ওস্তাগর, খানসামা, মুদি, ধোপানি প্রভৃতির নাম থেকে উদ্ভুত। যেমন—আসকর মিস্ত্রি লেন, গুলু ওস্তাগর লেন, চমরু খানসামা লেন, ছিদাম মুদি লেন, রানী মুদির গলি, পাঁচি ধোপানির গলি, ছকু খানসামা লেন, মিস্ত্রিপাড়া লেন, রহিম ওস্তাগর রোড ইত্যাদি।

(ছ) কতকগুলি রাস্তা ও জায়গার নাম করা হয়েছে পণ্যদ্রব্য অনুযায়ী। যথা:

কটন স্ট্রিট, তুলাপটি, কাঠগোলা লেন, দইহাটা, খ্যাংড়াপটি, সিন্দুরিয়াপটি, গরাণহাটা, চাউলপট্টি রোড, মুরগিহাটা, চিংড়িহাটা ইত্যাদি।

(জ) কতকগুলি রাস্তা ও জায়গা এককালের পুকুরের নাম বহন করে। যেমন—কাঁটাপুকুর লেন, চুনাপুকুর লেন, ঝামাপুকুর লেন, তনুপুকুর রোড, তালপুকুর রোড, পদ্মপুকুর রোড, শ্যামপুকুর, জোড়াপুকুর লেন, হেদুয়া, গোলদিঘি, লালদিঘি ইত্যাদি।

(ঝ) কতকগুলি রাস্তার একটু অদ্ভুত রকমের নাম আছে। যেমন চোরবাগান লেন, হাতিবাগান রোড ইত্যাদি।

(ঞ) ছ'টি রাস্তার নাম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। বইয়ের নামে দুটো রাস্তা আছে। যথা—বিশ্বকোষ লেন ও স্বর্ণলতা স্ট্রিট। আর চারটি রাস্তা হচ্ছে লাইব্রেরি রোড, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, ন্যাশনাল লাইব্রেরি রোড ও বয়েজ ওন লাইব্রেরী রোড।

অনেক রাস্তার নামের উৎপত্তির খেই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যেমন গড়িয়া, গরচা, গোবরা, তিলজলা, ঢাকুরিয়া, শিয়ালদহ, তপসিয়া, ট্যাংরা, চেতলা, সিঁথি।

পুরানো কলকাতার অনেক নাম এখন পাল্টে গিয়েছে। যদিও সর্বদা নতুন নামে তাদের ডাকা হয় না। যেমন ক্লাইভ স্ট্রিট হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড, চৌরঙ্গী হয়েছে জওহারলাল নেহরু রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট হয়েছে বিধান সরণি, ধর্মতলা স্ট্রিট হয়েছে লেনিন সরণি, হ্যারিসন রোড হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড, থিয়েটার রোড হয়েছে শেক্সপীয়র সরণি, গ্রে স্ট্রিট হয়েছে অরবিন্দ সরণি, হ্যারিংটন স্ট্রিট হয়েছে হো চি মিন সরণি ইত্যাদি। হেস্টিংস স্ট্রিট হয়েছে কিরণশঙ্কর রায় রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট হয়েছে রামমোহন সরণি, লিন্ডসে স্ট্রিট হয়েছে নেলী সেনগুপ্ত সরণি, রিপণ স্ট্রিট হয়েছে মুজাফর আহমেদ রোড, অকটারলনী রোড হয়েছে রানী রাসমণি রোড, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট হয়েছে আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নাম হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রিট, কিড স্ট্রিটের নাম হয়েছে মহম্মদ ইশাক রোড, মটস লেনের নাম হয়েছে মতিলাল সাহা লেন, ব্রাবোর্ন রোডের নাম হয়েছে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ রোড, বৌবাজার স্ট্রিটের নাম হয়েছে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিটের নাম হয়েছে বিপ্লবী রাসবিহারী স্ট্রিট, সুটারকিন ষ্টিটের নাম হয়েছে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, চিৎপুর রোডের নাম হয়েছে রবীন্দ্র সরণি, গান ফাউন্ডারী রোডের নাম হয়েছে খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি রোড, আপার সার্কুলার রোডের নাম হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও লোয়ার সার্কুলার রোডের নাম আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড।

কলকাতার সবচেয়ে লম্বা রাস্তা বোধহয় আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, আর সবচেয়ে চওড়া রাস্তা সাদার্ন অ্যাভেন্যু। ১৯১২ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবার পর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যেসব নতুন রাস্তা তৈরি করেছে, তার মধ্যে প্রধান চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, বি কে পাল অ্যাভেন্যু, গ্রে স্ট্রিট এক্‌স্‌টেনসন, কালাকার স্ট্রিট, ব্রাব্রোর্ন রোড, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু,

সাদার্ন অ্যাভেন্যু ইত্যাদি। সবচেয়ে পুরানো নাম এখনো বজায় আছে— (১) অ্যান্টনী বাগান লেন—অ্যান্টনী সাবর্ণ চৌধুরীদের নায়েব ছিলেন। (২) বাগবাজার স্ট্রিট—অবৈধ বণিক পেরিন সাহেবের বাগান (বাগান=বাগ) থেকে এ নামের উদ্ভব। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারে প্রজাবিলি করা হয়। (৩) বাঁকশাল স্ট্রিট—রাস্তার মোড়ে ওলন্দাজদের বাঁকশাল বা টোল অফিস ছিল। (৪) কয়লাঘাট স্ট্রিট—পুরানো কেল্লার (কেল্লা- < কয়লা) ঘাটে যাবার রাস্তা। (৫) ফ্যান্সি লেন। এখানে একটা ফাঁসি মঞ্চ ছিল / (ফাঁসি০ > ফ্যান্সি) (৬) পার্শিবাগান লেন—দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমসাময়িক বিখ্যাত বণিক রুস্তমজি কাওয়াসজির নামে অভিহিত। (৭) জেলিয়াপাড়া লেন—কলকাতার প্রাচীন জেলেদের পল্লী। বছরের শেষ দিনে এখান থেকে শ্লেষাত্মক সঙ বেরুত। নাম 'জেলেপাড়ার সঙ'। (৮) প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট—আগেকার নাম নিমু খানসামা লেন ও হাড়কাটা গলি। কলকাতায় অন্যতম বেশ্যাপল্লী। (৯) পার্ক স্ট্রিট—সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের এখানে এক সুবৃহৎ বাগান বাড়ি (পার্ক) ছিল। ইম্পে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বন্ধু ছিল এবং তার সঙ্গে চক্রান্ত করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। এই রাস্তায় অবস্থিত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাড়িতে আগে Sans souci থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর তারিখে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মিসেস ইসথার লীচ আগুনে পুড়ে মারা যান। রাস্তাটির আগে নাম ছিল 'বেরিংগ্রাউন্ড রোড', কেননা এই রাস্তা দিয়ে সাহেবদের শবাধার কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হত। (১০) স্ট্র্যান্ড রোড—১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লটারি কমিটি এই রাস্তাটি তৈরি করে। (১১) হরিণবাড়ি লেন—এখানে পুরানো জেলখানা ছিল। (১২) বেণ্টিক স্ট্রিট—আগে নাম ছিল কসাইটোলা। এই রাস্তার ওপর এক সময় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হাউস ছিল।

রাস্তার নাম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার কয়েকটি থানার নাম পরিবর্তিত হয়নি। সেগুলি হচ্ছে—আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা, হেয়ার স্ট্রিট থানা।

বর্ষায় কলকাতার আজ যে হাল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, কলকাতায় যথোপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাব। আজকের এই পরিস্থিতি যদি আর দশ-পনেরো বৎসর স্থায়ী হয়, তাহলে কলকাতা ভিনিস নগরীতে পরিণত হবে। তখন কলকাতার রাস্তায় মোটরগাড়ি বা অন্য যানবাহন আর চলবে না চলবে একমাত্রা নৌকা।

দশ

সে-কালের কলকাতায় লোক গ্রাম থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনত তাদের পুরোহিত ও নাপিত—যাতে না শহরে তাদের ধর্মকর্ম বিঘ্নিত হয়। আরও আনত যৌথ পরিবার ও গ্রাম-সম্পর্ক প্রথা। যৌথ পরিবারে থাকত বৃদ্ধ পিতা-মাতা, খুড়ো-জ্যাঠা, খুড়ি-জ্যাঠাইমা, বিধবা পিসি ও বোন, ও তাদের সকলের ছেলেপুলে। এই বৃহৎ পরিবারকেই বলা হত যৌথ পরিবার। এটা আজকের পরিবার থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের পরিবারের অঘোষিত সরকারি 'মডেল' হচ্ছে বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। দু'খানা ঘর, একটা 'বাথ' ও একটা কিচেন'—এই

হচ্ছে আজকের ফ্ল্যাট বাড়ির স্বরূপ। সেখানে বাপ-মায়েরই জায়গা নেই, বিধবা পিসি-বোন তো দূরের কথা।

সেকালের যৌথ পরিবারে বয়ে যেত আনন্দ-উৎসবের লহরী। জামাই-ষষ্ঠী বা ভাইফোঁটার সময় বাড়িতে যজ্ঞি পড়ে যেত। অরন্ধন ও পৌষপার্বণের সময়েও তাই। বহু আত্মীয়-স্বজন একছাদের তলায় বাস করত বলে সকলের মুখেই প্রকাশ পেত আনন্দ প্রীতির ছাপ। কারুর সঙ্গে কারুর দ্বেষ-বিদ্বেষ ছিল না। হয়তো বিধবা পিসির শুচিবাই থাকত। তাই নিয়ে কেউ রাগ বা বিরক্ত হত না। বরং তাই নিয়ে সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আনন্দ উপভোগ করত।

সে যুগে এটা সম্ভবপর ছিল বাড়ির কর্তার দক্ষতা ও সহানুভূতির জন্য। তাঁর থাকত, তীক্ষ্ণ নজরদারি। তিনি কোনো রকম ভেদাভেদ বা পক্ষপাতিত্ব করতেন না। পূজার সময় সকল বৌমাদের জন্য একই রকম শাড়ি কিনতেন। নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য যেরূপ জামাকাপড় বা জুতা কিনতেন, ভাইপো-ভাইজি, এমনকি বিধবা বোনের ছেলেমেয়েদের জন্যও সেইরকম পোশাক-আশাক কিনতেন। কোনোরকম বৈষম্য বা তারতম্য করতেন না। খাওয়া-দাওয়ার এবং শিক্ষার বিষয়েও ঠিক একইরকম নিয়ম অনুসরণ করতেন।

এই যৌথ-পরিবার ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রামের লোক যখন শহরে এল, তখন এখানে তুলে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়। শহরে এসে তারা পাড়ার লোকের সঙ্গে গ্রামের মতো 'গ্রাম-সম্পর্ক' পাতাল। পাশের বাড়ির শ্যামাবাবুকে 'শ্যামঠাকুরদা', তার পাশের বাড়ির চণ্ডীবাবুকে 'চণ্ডীকাকা' বলে ডাকতে আরম্ভ করল। এই সকল সম্পর্ক খুব হার্দিক ধরনের হত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কাজির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'দেহ-সম্পর্ক হইতে হয় গ্রাম-সম্পর্ক' সাঁচা। এইভাবে এক একটা পাড়া এক একটা বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, পাড়ার কোনো জামাইয়ের যদি তার শ্বশুরবাড়ির পাড়ার শ্বশুরমশাইয়ের গ্রাম-সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পথে দেখা হত, তবে তাঁর পায়ের ধুলো নিত। আমার বাল্যবন্ধু শ্যামাচরণের গ্রাম-সম্পর্কিত এক কাকা কলকাতায় এলে, আমরাও তাঁর পায়ের ধুলো নিতাম। এই 'কালচার'-এর ওপর যে হিন্দু সমাজের সংহতি গঠিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সেকালের যৌথ পরিবারে ঠাকুরমাই ছিল সবচেয়ে প্রিয়জন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরমার আসরে বসে ছেলেমেয়েরা রাজপুত্তর-রাজকন্যার গল্প শুনত ও ঠাকুরমার দেওয়া ধাঁধার ছড়ার উত্তর দিত। একটা ছড়ার উদাহরণ দিই 'এপাড়া হতে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুন পাড়া'। তাছাড়া নাতি-নাতনির বিয়ের বাসরঘরে ঠাকুরমাদের রসিকতাই ছিল প্রাণ।

বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো হত নানারকম ছড়া সুর করে গেয়ে। যথা—মাসী পিসি ঘুম পাড়ানী, ঘুমের বাড়ি গেছে', বা 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়ল বর্গী এল দেশে' বা 'খুকু যাবে শশুর বাড়ি উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে' ইত্যাদি।

বাপ-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। বাপ-মারাও ছেলেমেয়েদের যত্নের সঙ্গে মানুষ করত। তাদের শিক্ষা ও লালন পালনের ভার আজকালকার মতো প্রাইভেট টিউটর বা 'ক্রেস'-এর আয়ার ওপর ছেড়ে দিত না। ছেলেমেয়েদের কাছে বাপ-মা ছিল 'ঠাকুর'। যদি কেউ কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করত 'তোমার ঠাকুরের নাম কী?' সে সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাবার নাম বলত। 'ঠাকুর' শব্দের এই অর্থ এখন অভিধানের মধ্যে নিবদ্ধ।

সেকালের মেয়েরা গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। যদি স্বামীর নাম 'রাম' হত, তো বলত 'ফাম'। হ্যাঁ, স্বামী গুরুজনের মধ্যেই পড়ত।

পরিবার মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে সে যুগে ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। তাছাড়া, শাশুড়িরা জামাইবাড়ি যেত না।

সে যুগে অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে খুব 'সই-পাতানো' প্রথা প্রচলিত ছিল। সইদের নামকরণ করা হত 'গঙ্গাজল', 'বকুল', 'গোলাপ' ইত্যাদি। পরস্পর সেই নামেই পরস্পরকে ডাকত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত 'সই-পাতানো' প্রথা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তারপর এ প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়।

সেকালের বিয়ে বাড়ি

পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজত। আজ আর তা বাজে না। তার স্থান দখল করে নিয়েছে মাইক-নিনাদিত গান। বিয়ের শাস্ত্রীয় আচারসমূহ ও মেয়েদের কৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনো বজায় আছে বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ও ভোজনের ব্যাপারে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ভোজপাণ্ডাদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে বাড়িতে ফলার ও ভাতের পরিবর্তে লুচি খাওয়ানো প্রবর্তিত হয়েছিল। বিয়ে বাড়ির রান্নাবান্নার ব্যাপারেও পাঁচ বাড়ির গিন্নিবান্নিদের আধিপত্যেরও অবলুপ্তি ঘটেছিল। তাদের স্থান দখল করে নিয়েছিল উড়িয়া বামুনের দল।

এই পরিবর্তিত পরিবেশেই আমি আমার ছেলেবেলার কলকাতার বিয়েবাড়ির রীতিনীতি দেখেছি। তখন সামাজিক রীতিনীতি ও জাতপাতের প্রাবল্য ছিল খুব কঠোর। তার একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। আমার যখন পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স, তখন পর্যন্তও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ, পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কর্মকর্তাকে নিজে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয়কে ব্রাহ্মণবাড়িতে গিয়ে করে আসতে হত। শহরে এ প্রথা এখন উঠে গিয়েছে। জানিনা পল্লীগ্রামে এখনো প্রচলিত আছে কিনা।

দুই

ভোজনের ব্যাপারে জাতপাতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণদের সর্বাগ্রে ভোজন করাতে হত। গৃহকর্তাকে সমবেত অতিথিদের সামনে গিয়ে বলতে হত— 'আপনাদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের গাত্রোত্থান করতে আদেশ হউক।' তাছাড়া ভোজ্যাদি ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেশিত করতে হত। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা পেতেন। ভোজন দক্ষিণার হার ছিল চার আনা থেকে এক টাকা। ব্রাহ্মণ ভোজন হয়ে গেলে, তারপর ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ডাকা হত।

আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ, বাড়ির মেয়েদের গিয়ে করতে হত। তা না হলে মেয়ে-নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হত না। এছাড়া নিমন্ত্রিতা মেয়েদের তাদের বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসতে হত, এবং ভোজন পর্বের পর তাঁদের আবার গাড়ি করে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দিতে হত। গত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এ প্রথা উঠে গেছে। আর যে সব নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দূর থেকে আসতেন, তাঁরা কর্মকর্তার কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকা আদায় করে নিতেন। তাও উঠে গেছে।

তিন

আর একটা প্রথাও এই সময়কালের মধ্যে উঠে গেছে। সেটা হচ্ছে বিবাহ বাসরে 'প্রীতি উপহার' বিতরণ করা। এগুলো কবিত্বপূর্ণ কাগজ। এগুলো হয় গোলাপী

রঙের বা রুমাল-সদৃশ এক রকম কাগজে লাল কালিতে বা সোনার জলে ছাপা হত। এগুলো বিয়ে বাড়ির মর্যাদার একটা মাপকাঠি ছিল। কেননা, লোক বিচার করত বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ কে ক'খানা 'প্রীতি উপহার' বিলি করেছে।

মনে রাখতে হবে যে আমার ছেলেবেলাটা ইলেকট্রিক আলোর যুগ ছিল না। সেজন্য বিবাহ বাসর আলোকিত করবার জন্য 'খাস গেলাস' ও ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন ব্যবহৃত হত। এগুলো রেড়ির তেল বা মোমবাতির সাহায্যে জ্বালানো হত। পরে ছাদের ওপর হোগলার মেরাপের তলায় যেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো হত, সেখানে থাকত কারবাইড গ্যাসের আলো।

শতাব্দীর গোড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির বর আসত চতুর্দোলায় চেপে। ব্যান্ড বাজত ও দুধারে আলোর শোভা থাকত। ফিরে যাবার সময় কনে যেত মহাপায়ায় (শিবিকা বিশেষ) করে। ১৯২০ সাল নাগাদ এগুলো সব উঠে যায়।

বর এলে বরযাত্রীদের গায়ে গোলাপ জল ছিটানো হত। বরকে বসানো হত বরের আসনে। দুধারে থাকত দুটো ফুলের তোড়া ও দুটো বাতিদান। বরযাত্রীদের গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত। এটাই ছিল বরযাত্রীদের লক্ষণ। কেননা বরযাত্রীদের বিশেষ সমাদর করে কন্যাপক্ষীয়দের আগে খাওয়ানো হত।

চার

এবার বলি বিয়ের নিমন্ত্রণে কি খাওয়ানো হত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাধারণত খাওয়ানো হত কর্মকর্তার নিজবাড়িতে, এখনকার মত 'বিয়েবাড়ি' ভাড়া করে নয়। এর জন্য বাড়ির ছাদে হোগলা দিয়ে একটা মণ্ডপ তৈরি করা হত। তারপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের হালসীবাগানের সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পদাঙ্কে নানারকম উপায় অবলম্বিত হয়, যার শেষ ফলশ্রুতি হচ্ছে ভাড়াকরা 'বিয়েবাড়ী'। আরো যা পরিবর্তন ঘটেছে তা হচ্ছে, সেকালে বিয়েবাড়িতে মেঝের ওপর কুশাসন পেতে বসিয়ে কলাপাতার ওপর খেতে দেওয়া হত। কলাপাতার ডানদিকের সর্বোচ্চ কোণে থাকত লবণ ও একখণ্ড পাতিলেবু। আর কলাপাতার সামনে থাকত জলপূর্ণ মাটির গেলাস ও দই এবং ক্ষীর দেওয়ার জন্য মাটির খুরি। ভোজনপর্ব শুরু হত দু'খানা গরম লুচি ও বেগুন বা পটলভাজা দিয়ে। ক্রমে ক্রমে আসত কুমড়ার ছক্কা (বা শীতকালে বাঁধাকপির তরকারী), ডাল, ধোঁকা বা আলুর দম, মাছের কালিয়া, চাটনি, পাঁপড় ভাজা ও মিষ্টান্ন। মিষ্টান্নের মধ্যে দেওয়া হত মিহিদানা, লেডিকেনী, রসগোল্লা, সন্দেশ, দই, ক্ষীর। সকলের শেষে দেওয়া হত পান। এটা সাধারণ গৃহস্থবাড়ির বিয়ের ভোজ্যের ফর্দ। এটাই ছিল মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়িরও বিয়ের ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা। অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়িতে এর সঙ্গে যুক্ত হত পোলাও, মাংস, আরো অনেক রকম মিষ্টান্ন ও রাবড়ি। ভোজনের সময় পরিবেশনকারীরা দফায় দফায় আনত সবরকমই ভোজ্যদ্রব্য। তার মানে আগেকার দিনের বিয়ে বাড়িতে যে যত খেতে চাইত, সে তা পেত।

সেকালের বিয়ে বাড়িতে ছাঁদা বাঁধার একটা রেওয়াজ ছিল। ছাঁদাবাঁধা হচ্ছে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য একখণ্ড কাপড়ে পরিবেশিত সমস্ত রকম দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষ করে লুচি ও মোণ্ডা বেঁধে নেওয়া।

আর একটা রীতি ছিল। ভোজন সমাপ্তির পূর্বে কর্মকর্তা সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে, ভোজনে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেন।

মেয়েদের খাওয়ানো পৃথক পঙ্‌ক্তিতে করা হত এবং সেখানে মেয়েরাই পরিবেশন করত। সেখানে ভোজনের শেষে গৃহকর্ত্রী এসে প্রত্যেককে ভোজনে সন্তোষ লাভ করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করত।

এখন বিয়ে বাড়ির খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকেদার ক্যাটারারদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাদরও হ্রাস পেয়েছে।

পাঁচ

সেকালে লৌকিকতা করা হত আট আনা বা এক টাকা দিয়ে। বিশিষ্ট অতিথিরা বা আত্মীয়রা চার টাকা পর্যন্ত দিতেন। পরে টাকার বদলে বই উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এখন দামী কাপড় বা অন্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে এক পরিবার অপর পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দেয়। আজ মধ্যবিত্ত সমাজের অবনতির এটাও একটা কারণ। লৌকিকতাটা আজ সমাজ থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।

বিশ্বাস, যাদু ও তুকগুণ

আশি-নব্বই বছর আগে পর্যন্ত এ দেশে এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি নামগুলো খুব প্রচলিত ছিল। আজ আর নেই। কেননা যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাঙালী মায়েরা এই নামগুলো রাখত, সে বিশ্বাস আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাঙালী মায়েরা তখন বিশ্বাস করত যে মৃতবৎসা নারী যদি সন্তান প্রসবান্তে কোন সন্তানবতী মায়ের কাছে সে সন্তানকে সমর্পণ করে, ও পরে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বলে এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাতটা কড়ি দিয়ে ফেরত নেয় তাহলে সে সন্তান আর মারা যাবে না। যত সংখ্যক কড়ি দিয়ে কিনত, সেই অনুযায়ী সে ছেলের নাম রাখা হত। এটা ছেলের আয়ু অর্জন করবার একটা যাদু বিশেষ ছিল। নাম রাখা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে মাত্র এই একটি যাদুই প্রচলিত ছিল না। আরো যাদুভিত্তিক বিশ্বাস ও প্রথা বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন বাঙালী বিশ্বাস করত যে যদি দুই ছেলে বা দুই মেয়ের পর যথাক্রমে মেয়ে বা ছেলে হয়, তা হলে সেই ছেলে বা মেয়ের মঙ্গলার্থে কোন উচ্চস্থান থেকে একটি তৈজসপত্র নীচে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে ফেললে এবং সেই ছেলের বা মেয়ের নামের আদ্যাক্ষর 'শ', 'স' বা 'ষ' দিয়ে রাখলে, সেই ছেলে বা মেয়ের জন্মগত দোষ কেটে যাবে। এই ভাবেই সরোজ, সরোজিনী, সুষমা, শৈব্যা, শৈবালিনী, শ্যামা, শ্যামচাঁদ, ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীব্রত ইত্যাদি নামগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল। বাঙালী আরো বিশ্বাস করত যে ছেলেপুলেদের ঠাকুর দেবতাদের নাম রাখলে তাদের মঙ্গল হবে, এবং তাদের ওপর ভুতপ্রেতের নজর পড়বে না। সেজন্য তারা ছেলেমেয়েদের নাম রাখত রামকৃষ্ণ, রাধাচরণ, জগন্নাথ, বলরাম, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, জনার্দন, সরস্বতী, কালী, সতী ইত্যাদি। এসব নাম আজ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে। আরো অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে মেয়েদের থাকমনি, এলোকেশী, মহামায়া, অন্নপূর্ণা, ব্রহ্মময়ী ইত্যাদি নাম। এছাড়া ছিল 'দোর ধরা' নাম। সন্তানহীনা নারী কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মানত করে যে সন্তান পেতেন, তার নাম রাখতেন সেই দেবতার নামে। যেমন পাঁচুঠাকুরের কাছে মানত করে যে সন্তান পেতেন তার নাম রাখতেন পঞ্চানন। তারকেশ্বরে ধর্ণা দিয়ে যে সন্তান লাভ করতেন তার নাম রাখতেন তারকনাথ ইত্যাদি।

ছেলেপুলেদের নামকরণ সম্বন্ধে মাত্র উপরোক্ত বিশ্বাস ও প্রথাই যে কার্যকর ছিল তা নয়। জ্যোতিষের প্রভাবও ছিল। যে ক্ষেত্রে সন্তানের কোষ্ঠী-ঠিকুজী তৈরি করা হত, সে-সব ক্ষেত্রেই মাত্র এটা অনুসরণ করা হত। হিন্দু জ্যোতিষ অনুযায়ী রাশিচক্রের যে-ঘরে চন্দ্র থাকে, সেটাই জাতকের রাশি। রাশি অনুযায়ী জাতকের নামের আদ্যাক্ষর নির্ণীত হত। যথা মেষরাশির অ, ল, বৃষরাশির উ, ব, মিথুন রাশির ক, ছ, কর্কট রাশির ভ, হ, সিংহ রাশির ম, ট, কন্যারাশির

গ, ঠ, তুলারাশির র, ত, বৃশ্চিক রাশির ন, য, ধনুরাশির ধ, ভ, মকর রাশির খ, জ, কুম্ভ রাশির গ, শ, মীন রাশির দ, চ ও, ঝ। তবে অনেক সময় রাশি অনুযায়ী নাম কোষ্ঠী-ঠিকুজিতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় থেকে যেত। ওটা প্রকাশ করা হত না। কেননা আগেকার দিনের লোকের বিশ্বাস ছিল যে রাশি-নাম প্রকাশ করলে শত্রু পক্ষ গুণতুক করে তার ক্ষতি করবে। সেজন্য রাশি নামের পরিবর্তে ছেলেপুলের অপর কোন নাম রাখা হত।

আগেকার দিনের এ-সব প্রথা ও বিশ্বাস আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ-ই ছেলের নাম গদাধর, হলধর, পীতাম্বর, বা যুধিষ্ঠির রাখে না। তৎপরিবর্তে রাখে অভীক, অরূপ, অনীক, অরুণ, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, সৌমিত্র, উত্তমকুমার, রবীন্দ্র ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মেয়েদের নাম রাখা হয় সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, প্রিয়া, লীনা, রীনা, কেতকী, শেফালি, কাবেরী ইত্যাদি। দিনে দিনে বাঙালী আজ ছেলেপুলেদের নতুন নতুন নাম আবিষ্কার করছে।

দুই

ব্যবহারিক জীবনেও লোকের বিশ্বাস ও প্রথার কুল কিনারা ছিল না। বাম অঙ্গ বিশেষ করে পা বা চোখ নাচলে সেটা অমঙ্গল মনে করত। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, অপর কেউ নাম করছে। কারুর নাম করার সময় তার আগমন ঘটলে বলা হত সে অনেকদিন বাঁচবে। পাড়ায় বিড়াল কাঁদলে সেটা অমঙ্গল বলে মনে করত। শনি বা মঙ্গলবারে পাড়ায় কেউ মারা গেলে সেটা অলক্ষণ বলে মনে করত এবং বলত, পাড়ায় আরো তিনজন মারা যাবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দিত না, বলত এটা অশুভ। শুভকর্মে বিধবার উপস্থিতিও অশুভ বলে মনে করত। একাদশীর দিন সধবা স্ত্রীলোক মাছ না খেলে বলত তার কপালে বৈধব্য যোগ আছে। সধবা স্ত্রীলোক স্বামীর আগে কখনো অন্নগ্রহণ করত না। সেকালের লোক ভুতপ্রেতে খুব বিশ্বাস করত। তবে ভাবত রাম নাম করলে বা কাছে লোহা থাকলে ভুতপ্রেত তার কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না। কেউ এক চোখ দেখালে ঝগড়া হবে, এবং সেজন্য তাকে দুচোখ বন্ধ করে দেখাতে বলত। মেয়েরা রাত্রে চুল বাঁধত না বা সিঁথিতে সিঁদুর পরত না। বলত এরূপ করলে সে মেয়েছেলে কুলটা হবে। রাত্রে হাত থেকে তৈজসপত্র পড়ে গেলে ভাবত রাত্রে বাড়িতে চোর আসবে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কোনরূপ 'বাধা' পড়লে, ফিরে এসে একবার বসে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করত। বাচ্চা ছেলেরা দুধ তুললে বলত ছেলের ওপর কারুর 'নজর' পড়েছে, বয়স্ক লোকেরাও বিশ্বাস করত যে খাবার সময় কেউ তাদের পাতের দিকে চাইলে, সে তার খাওয়ার ওপর 'নজর' দিচ্ছে, এবং তাতে তার বদহজম হবে। যদি কেউ কারুকে বলত যে তার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে, তাহলে ভাবত সে তার শরীরের ওপর 'নজর' দিচ্ছে, এবং শীঘ্রই তার শরীরের পতন ঘটবে। বিয়ের সময় লোক যে পথে যেত, বাড়ি ফেরবার সময় সে পথে আসত

না। অন্য পথ দিয়ে আসত। অপদেবতার 'নজর'-এ বিশ্বাস করত। শনি বা মঙ্গলবারে মেয়েরা ছেলেমেয়েদের কোলে করে নিম, তেঁতুল, বেল ও শ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে যেত না। ভাবতো তাতে ছেলেপুলেদের ওপর অপদেবতার 'নজর' লাগবে। রাত্রিকালে ফাঁকা জায়গায় কখনো ছেলেপুলেদের কাঁথা, জামাকাপড় ইত্যাদি শুকোতে দিত না। মনে করতো এরূপ করলে অপদেবতার 'নজর' পড়বে। সকালে মাকুন্দ লোকের মুখ দেখলে ভাবত সেদিনটা তার ভাল যাবে না। সকালে কৃপণ লোকের নাম করলে বলত সমস্ত দিনটাই তার খারাপ যাবে। বলতো সেদিন তার 'হাঁড়ি ফাটবে'। তার মানে সেদিন তার কপালে অন্ন জুটবে না। কোন শুভকাজে বেরুবার সময় তিনজন লোক কখনো একসঙ্গে বেরুত না। হয় দু'জন, আর তা না হলে চার জন যেত। বেরুবার সময় যদি কেউ (নিজ মা ব্যতীত) পিছু ডাকত, তা হলে ভাবত সে যে কাজে যাচ্ছে, সে-কাজ পণ্ড হবে। অনুরূপভাবে যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে সেটা অমঙ্গলসূচক ভাবত। শনি-মঙ্গলবারে কখনো নতুন কাপড় 'ভাঙত' না। ক্ষৌরকর্মে বুধবারটাই শুভ বলে মনে করত। হাতে শাঁখা বা পাথরের বাসন-কোসন ভেঙে গেলে সেটা খুব অমঙ্গলসূচক বলে মনে করত। বিয়ের সময় বর-কনের 'গণ'-এর মিল দেখত। এ-রকম অজস্র বিশ্বাস ও প্রথা বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া, ডাক ও খনার নানারকম বচনে বিশ্বাস করত। এখনো অনেক বাঙালী সে-সব বচনে বিশ্বাস করে। যেমন 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।', 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছে তথা যা', 'আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়ে', 'চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বাণ, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান', 'শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে। এই সপ্তকর্মে হাঁচি আদি সুশোভন।'

তিন

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালী সমাজে নাম উচ্চারণ ও ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ বা taboo ছিল। মেয়েরা স্বামীর, শ্বশুর-ভাশুরের ও অন্যান্য গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করত না। তাঁদের নাম উচ্চারণ করতে হলে নামের আদ্যাক্ষর পরিবর্তন করে উচ্চারণ করত। মাত্র তাই নয়। অন্য কোন জিনিসের মধ্যে যদি সেরূপ কোন নামের উচ্চারণগত শব্দ থাকত, তা হলেও ওইরূপ অক্ষর পরিবর্তন করে নিত। যেমন যদি কারুর শ্বশুরের নাম রামচন্দ্র হত, তাহলে সে রামায়ণ শব্দের পরিবর্তে 'ফামায়ণ' বলত।

ছোঁয়াছুয়ি সম্বন্ধে যে সব বিধিনিষেধ ছিল, তার মধ্যে ভাশুর ও মামাশ্বশুরকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ ছিল। যদি দৈবাৎ তাঁদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত, তা হলে 'ধান সোনা উৎসর্গ' করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

মাত্র সরাসরি ছোঁয়াছুঁয়ি নয়। ছোঁয়াছুঁয়ির সংক্রমণেও বাঙালী বিশ্বাস করত। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাঙলার অন্যতম যানবাহন ছিল পালকি। পালকি বাহকরা সাধারণত দুলে-বাগদি জাতির লোক হত। সেজন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্ণের

নিষ্ঠাবতী মহিলারা যে বস্ত্রে পালকিতে যেতেন, সে বস্ত্র পরিবর্তন না করে পূজা আহ্নিক বা আহার করতেন না।

রন্ধনশালাতেও বিধবাদের রান্নার জন্য স্বতন্ত্র উনুন ও তৈজসপত্র থাকত, এবং পাছে সেখানে আমিষ রান্নার উপকরণের জন্য ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, তা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হত।

চার

গুণতুকেও 'সে আর এক কলকাতা'র লোক বিশ্বাস করত। গ্রামগঞ্জে এখনো করে। যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় জবাফুল ও অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রদীপ রয়েছে, তাহলে বাঙালী তার ত্রিসীমানায় যায় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে এগুলো তারাই রেখে যায় যাদের পরিবারে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যারা রেখে যায় তাদের বিশ্বাস যে যারা ওগুলো মাড়াবে বা স্পর্শ করবে, তারা সেই রোগে আক্রান্ত হবে এবং তাদের রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এক পরিবারের বিপর্যয় অপর পরিবারে সংক্রামিত করবার মনোবৃত্তি নিয়েই এগুলো করা হত। নৃতত্ত্বের ভাষায় এ প্রণালীকে সংক্রমণ যাদু বা Contagious magic বলা হয়। 'নিশিডাক'ও এরূপ সংক্রমণের আর এক দৃষ্টান্ত। 'নিশিডাক'টা কি তা এখানে বুঝিয়ে বলা দরকার। যদি কোন পরিবারে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তা হলে তারা গুণিনের সাহায্য নেয়। গুণিন এসে একটা ডাবের মুখ কেটে সেটাকে মন্ত্রপূত করে। তারপর সেই পরিবারের লোক সেই ডাবটাকে নিয়ে গভীর রাত্রে কারুর বাড়ি গিয়ে তার নাম ধরে ডাক দেয়। যাকে ডাকা হয়, সে উত্তর দেওয়া মাত্র, যে লোক ডাবটা নিয়ে গেছে সে ডাবের মুখটা বন্ধ করে দেয় এবং সরে পড়ে। যারা এরূপ করে তাদের বিশ্বাস তাদের রোগীর ব্যাধি ওই লোকটাতে সংক্রামিত হ'ল। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে কেউ গভীর রাত্রে কারুর নাম ধরে ডাকলে, তিনবার ডাকবার আগে উত্তর দেয় না। কেননা তিনবারের আগে উত্তর না দিলে এই প্রক্রিয়া সফল হয় না। যদি তিনবারের আগে লোকটা উত্তর না দেয়, তাহলে সে সেখান থেকে সরে পড়ে এবং দূরে অপর কোন বাড়িতে গিয়ে চান্স্ নেয়। একশ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার মতো শহরের লোকরাও 'নিশিডাক'-এ বিশ্বাস করত। এখন আর করে না। কিন্তু গ্রামের লোকরা এখনো বিশ্বাস করে, এবং রাত্রিকালে কেউ তিনবার না ডাকলে উত্তর দেয় না। তবে শহরের লোক এখন 'নিশিডাক'-এ বিশ্বাস না করলেও, রাস্তার তেমাথায় রাখা জবাফুল ইত্যাদিকে ভয় করে ও তার ত্রিসীমানায় যায় না। এমন কি সকালে পুরসভার ঝাড়ুদাররা পর্যন্ত সকালে রাস্তা ঝাঁট দিতে এসে যদি তেমাথায় ওরূপ ফুল ইত্যাদি দেখে, তাহলে সে জায়গাটাকে বাদ দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেয়।

পাঁচ

বাঙলা দেশের লোক বিশ্বাস করে যে 'বাদুলে' (বর্ষাকালে যাদের জন্ম) ছেলেমেয়ের

বিয়ের সময় বৃষ্টি হবেই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, যাতে না বৃষ্টি হয়, তার জন্য যাদুর আশ্রয় নেয়। এর জন্য দু'রকম প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে বাটনা বাটবার শিলখানাকে উলটো করে আকাশের দিকে মুখ করে, কোন খোলা জায়গায় পেতে রাখা। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিবেশী কারুর বাড়ি থেকে তাকে না বলে একটা তৈজসপত্র এনে সেটা কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা। বাঙালী মেয়েদের বিশ্বাস এরূপ করলে বৃষ্টি হবে না, এবং তাদের বিবাহের আনন্দ নষ্ট হবে না। কাকতালীয় হউক, আর নাই হউক, দেখা গিয়েছে সত্যসত্যই বিয়ের সময় বৃষ্টি হয় না।

ছয়

বিপদ ও বিপর্যয় এড়াবার জন্য তাবিজ, মাদুলী ইত্যাদিতে বিশ্বাস বাঙালী এখনো রাখে। স্বামীকে বশীভূত করবার জন্য বা শাশুড়ির গঞ্জনা বা নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বাঙালী মেয়েরা প্রায়ই এরূপ মাদুলী বা তাবিজ ধারণ করে। মকদ্দমায় জয়লাভের জন্য বা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যও বাঙালী মাদুলী বা তাবিজ ধারণ করে। যাঁরা এরূপ তাবিজ বা মাদুলী বিক্রয় করে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ তাদের ঠক-চাচা নাম দিয়েছেন।

গ্রহশান্তির জন্যও তাবিজ, মাদুলী ও আংটি ইত্যাদি ধারণ করা হয়। তাবিজ ও মাদুলী ছাড়াও বাঙালী দুষ্টগ্রহ প্রশমনের জন্য নানারূপ ধাতু, রত্ন ও মূলাদি ধারণ করে। যথা সূর্যের জন্য তামা, চন্দ্রের জন্য শঙ্খ, মঙ্গলের জন্য পলা, বুধের জন্য সোনা, বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য হীরা, শনির জন্য নীলা, রাহুর জন্য গোমেদ ও কেতুর জন্য পান্না। বিকল্পে সূর্যের জন্য বিল্বমূল, চন্দ্রের জন্য ক্ষীরিকামূল, মঙ্গলের জন্য অনন্তমূল, বুধের জন্য বিষধরকের মূল, বৃহস্পতির জন্য বামুনহাটির মূল, শুক্রের জন্য রামবাসকের মূল, শনির জন্য শ্বেতবেড়েলার মূল, রাহুর জন্য শ্বেতচন্দনের মূল, ও কেতুর জন্য অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করা হয়। আবার অনেক সময় গ্রহ প্রশমনের জন্য মন্ত্র উচ্চারণও করা হয়। রবির মন্ত্র হচ্ছে ওঁং হ্রীং সূর্যায়, চন্দ্রের ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়, মঙ্গলের জন্য ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়, বুধের জন্য ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়, বৃহস্পতির জন্য ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে, শুক্রের জন্য ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়, শনির জন্য ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়, রাহুর জন্য ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে, ও কেতুর জন্য ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।

সাত

'সে আর এক কলকাতা'র লোক ভূতে পাওয়াতে বিশ্বাস করত এবং ভূত ছাড়াবার জন্য রোজা ডাকত। সাপে কামড়ালেও রোজা ডাকত। রোজার সাপের বিষ বের করে দেবার ক্ষমতা আছে মনে করতো। অনেক সময় রোজারা কুকুরে কামড়ালে কুকুরের বিষও ঝেড়ে দিত।

কারুর কিছু চুরি গেলে গ্রামের লোক বাটি চালা, চালপড়া ও নখদর্পনের আশ্রয় নিত। বাটি চালায় মন্ত্রপূত বাটিটা নিজে নিজে চলতে থাকত ও আসামীর কাছে গিয়ে থেমে যেত। চালপড়ায় মন্ত্রপূত চাল সকলকে চিবোতে দেওয়া হত এবং যে চুরি করেছে মাত্র তার থুতুর সঙ্গে রক্ত প্রকাশ পেত। নখদর্পনে পারদর্শী ব্যক্তি সমবেত জনতার মধ্যে কোন ব্যক্তির বুড়া আঙুলের নখের ওপর কাজল লাগিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকত। ওই কাজলের মধ্যে দোষী ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যেত।

এই সকল প্রক্রিয়ায় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হত সেগুলো অনুধাবন করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে আদিমকালের ভাষা থেকে সেগুলি গৃহীত হয়েছে। কতকগুলি মন্ত্র আমার 'ফোক্ এলিমেণ্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ' গ্রন্থে দেওয়া আছে।

আট

এখনো বিপদসঙ্কুল জায়গায় যাবার জন্য লোক গুণিনের সাহায্য নেয়। যেমন সুন্দরবনের লোকেরা। সুন্দরবনের মানুষের প্রধান উপজীবিকা মাছ, কাঠ ও মধু। এই কারণে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়। কিন্তু গুণিন ছাড়া তারা কখনো জঙ্গলে যায় না। গুণিনই প্রথম জঙ্গলের মাটিতে পা দেয় ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। মন্ত্রটা হচ্ছে—'বনবিবি, ফুলবিবি, মাইবিবি ফতেমাবিবি/আমার মাল ছাড়া যদি যাও অন্য ঠাই/আর কি জানাই তোমায় ধর্মের দোহাই। আমার মালে উপরি বন্ধ, ফাঁপড়ি বন্ধ, ডাকিনী যোগিনী বন্দ, ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য বন্দ আমায় যে দেখাবি ভয়/সব অঙ্গ পোড়াব যা এই কয় কথায়।

গুণিন সঙ্গে থাকে, এবং তারা কখনো গুণিনের নির্দেশ ছাড়া জঙ্গলের কোনদিকে যায় না।

এই নিবন্ধের উপসংহারে বলি, আদিম কাল থেকেই মানুষ ধর্মের চেয়ে যাদুতেই বেশি বিশ্বাসী। তার কারণ, যাদুর মধ্যে কিছু বিজ্ঞান আছে, ধর্মের মধ্যে তা নেই। সেজন্য সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাউ' গ্রন্থে বলেছেন: 'Magic is older than religion in the history of humanity, and belief in its efficacy is the universal faith, the truly Catholic creed.'

নয়

আদর্শ নারীজীবনে পুত্রবতী হবার বাসনা যে মাত্র কুমারীদের দ্বারা পালিত ব্রতসমূহের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তা নয়। সধবা স্ত্রীলোকদের নানারূপ পূজার্চনা ও ধরনা বা 'হত্যা' দেবার ভিতর দিয়েও প্রকাশ পায়। সেজন্য পুত্রকন্যার বিয়ের অব্যবহিত পরে সত্যনারায়ণ ও সুবচনী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেননা বাঙালী সমাজে নিঃসন্তান ব্যক্তিকে সকলেই হেয় চক্ষে দেখে। সকলেরই ধারণা সকালে সেরূপ ব্যক্তির মুখ দেখলে দিনটা অত্যন্ত খারাপ যাবে। সেজন্য সন্তানবান ও পুত্রবতী হবার

কামনা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মনে তীব্র আকারে প্রকটিত থাকে। এই কামনা নিয়েই বাঙালী মেয়েরা দেবস্থানে ধরনা বা 'হত্যা' দেয়। যে-সকল দেবতার স্থানে তারা ধরণা বা 'হত্যা' দেয়। সে-সব দেবতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে শিব, কালী, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, পঞ্চানন, রঙ্কিনী, বিভিন্ন পীর, বর্গভীমা, মা ডুমনী, বড়কুমার ইত্যাদি। এছাড়া কতকগুলো ব্রতেরও প্রচলন আছে যথা : অশ্বত্থপাতা ব্রত, ইতুপূজা ব্রত, কলাছড়া ব্রত, কার্তিক ব্রত, কুক্কুটি ব্রত, চাঁপাচন্দন ব্রত, জয়মঙ্গলার ব্রত, জিতাষ্টমী, দুর্গাষষ্ঠী, পৃথিপূজা, ফল গছানো ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, রালদুর্গার ব্রত, সঙ্কটমঙ্গলবারের ব্রত, সন্তান দ্বাদশী ব্রত ইত্যাদি।

অন্দরমহলের পট পরিবর্তন

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার লোকের গৃহস্থালীতে ধামা, চুপড়ি, জাঁতা, কুলো, ধুনুচি, ঢেঁকি, হাতপাখা, হামানদিস্তা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বাসন-কোসনের মধ্যে প্রভূত পাথরের ও কাঁসার বাসন ছিল। পিতলের বাসনও ছিল। যেমন, পিতলের ঘড়া, পিলসুজ, প্রদীপ, রেকাবি ইত্যাদি। মাটির উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত-ডাল রান্না হত। রান্নাঘরে দুরকম উনুন থাকত—আমিষ ও বিধবাদের নিরামিষ রান্নার জন্য। এখন আর মাটির হাঁড়িকুড়িতে রান্না করা হয় না। বাসন-কোসনও পাথর-কাঁসা-পিতলের হয় না। অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস্ স্টীল তাদের জায়গা দখল করেছে। রান্না-বান্নাও আর মাটির উনুনে হয় না। কেরোসিনের স্টোভ, 'জনতা', ইলেকট্রিক বা গ্যাস উনুনে রান্না হয়।

দুই

রান্না ভাত কাপড়ে ঠেকলে কাপড় 'সকড়ি' হয়ে যেত। আবার কাপড় বদলাতে হত। কোন জায়গা 'সকড়ি' হয়ে গেলে ন্যাতা-গোবর দিয়ে সে-জায়গাটা শুদ্ধ করা হত। লোক মেঝের ওপর আসন বা কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে খেত। খাওয়া হয়ে গেলে ওই জায়গাটাও ন্যাতা-গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে ফেলত। এখন 'সকড়ি' সংস্কার ও ন্যাতা-গোবর উঠে গেছে। এ-বেলার রান্না রেফরিজেটারে তুলে রাখা হয়, রাত্রে বা পরদিন খাবার জন্য। তাতে রেফরিজেরেটার 'সকড়ি' হয় না। এখন মানুষ মাটির ওপর আসন বা পিঁড়ি পেতে বসে খায় না। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে খায়। এক্ষেত্রেও টেবিল 'সকড়ি' হয় না। তাছাড়া, মেয়েরা আর শিলনোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসে না। এখন গুঁড়ো মশলাতেই কাজ সেরে ফেলে। একই উনুনে আমিষ ও নিরামিষ রান্না হয়। বিধবারা স্বচ্ছন্দে তা খায়। এক কথায় আগেকার দিনের শুচিতা ও সকড়ি সংস্কার এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তিন

লোকে আগে গামছা পরে গাড়ু হাতে করে পায়খানায় যেত। পায়খানা করবার পর গামছাটা কেচে ফেলত। এখন আর ওসব বালাই নেই। লোকে পরিহিত কাপড় পরেই পায়খানায় যায়। গাড়ুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পায়খানা করবার পর 'হাতেমাটি' করার রীতিও এখন আর নেই। পায়খানায় গেলে কাপড় যে নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যায়, এবোধ এখন আর নেই। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসব পরিবর্তন ঘটছে।

মেয়েরা আগে হাতে কাঁচের চুড়ি ও কাপালে কাঁচপোকার টিপ পরতে ভালবাসত।

এখন হাতে রিস্ট-ওয়াচ ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে। মেয়েদের পায়ে মল বা তোড়াও উঠে গেছে। মেয়েরা এখন আর বুক পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না। আগে মেয়েরা জুতা পরত না। এখন জুতা পায়ে দেওয়া মর্যাদার একটা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আগে পথে বেরত না। এখন তারা একা-একাই সিনেমা-থিয়েটার ও বাজার-হাটে যাচ্ছে। অনেকে আপিসেও যাচ্ছে চাকরির কারণে।

চার

বাড়ির ভেতরেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে সেকালে মেয়েদের দুটো বড় কাজ ছিল—পান সাজা ও প্রদীপের সলতে পাকানো। এ-দুটোর কোনটাই এখন নেই। আগে বাড়ির ভেতর মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। ভাশুর-শ্বশুর বা অন্য কোন গুরুজন সামনে এসে পড়লে সরে দাঁড়াত। এখন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ভাশুর ও শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে, একসঙ্গে বসে খায় ও গা ঘেঁষাঘেষি করে সিনেমা-থিয়েটারে বসে।

প্রতি বাড়িতেই একটা করে আঁতুড়-ঘর থাকত। সেখানেই বাড়ির বৌ-ঝিরা প্রসব করত। মেয়েদের একমাস অশুদ্ধ বা অপবিত্র অবস্থায় আতুড় ঘরে থাকতে হত। একুশ দিন বা একমাস পরে ষষ্ঠীপূজা না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ হত না। এখন মেয়েরা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে ষেটেরা পূজা, চারকৌড়ে, আটকৌড়ে ইত্যাদি উঠে গেছে।

সেকালে কোন বাড়িতে ঝি-চাকর ঢুকলে, আজীবন তারা সেই বাড়িতেই থাকত এবং বাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে তাকে 'মাসী', 'দিদি' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত। এখন লোকে তাদের 'কাজের লোক' বলে এবং তাদের নাম ধরে ডাকে।

'হাতেখড়ি' না হলে সেকালে বিদ্যারম্ভ হত না। মেয়েরা পাঁচ থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত নানারকম ব্রতানুষ্ঠান করত। বিয়ের পর প্রথম রজঃদর্শনের সময় রজঃদর্শন উৎসব হত। এটা খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। গর্ভধারণের পর মেয়েদের তিনমাস পাঁচমাস ও সাতমাসে 'সাধ' হত। এগুলোও খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হত ও বৌদের বাপের বাড়ি থেকে 'তত্ত্ব' আসত।

পাঁচ

আগেকার দিনের মেয়েরা এখনকার দিনের মেয়েদের চেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণা ছিল। সকালে উঠে তারা পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করত, ও সদর দরজা থেকে শুরু করে সমস্ত বাড়িতে গোবরজলের ছিটা দিত। এছাড়া, সন্ধ্যেবেলায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করত। এখনকার মেয়েরা সে-সময়টা রেষ্টুরেণ্ট বা সিনেমায় কাটায়।

ছয়

এছাড়া, বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে আরো অনেক সংস্কার ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে লোক ভিখারীকে কখনো ফিরিয়ে দিত না। তবে অশৌচকালে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়েরা কখনো দু-চার কণা চাল মাটিতে ফেলত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল মাটিতে পড়লে, সে কন্যাসন্তান প্রসবিণী হবে। সেকালে নিঃসন্তান লোকের নাম করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ওরূপ লোকের নাম করলে সেদিন তাদের অন্ন জুটবে না। যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে, সেটাকে অমঙ্গল জ্ঞান করত এবং পুনরায় ফিরে এসে অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করত। তাছাড়া, লোক বিশ্বাস করত যে বাঁ চোখ কাঁপা, বা বাঁ অঙ্গ যদি নাচে, তা হলে তার ক্ষতি হবে। অঙ্গে টিকটিকি পড়াতেও বিশ্বাস করত। আরো বিশ্বাস করত যে মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামলে তিনদিন, আর শনিবারে নামলে সাতদিন বৃষ্টি হবে। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, কেউ তার নাম করছে। এছাড়া, বৃহস্পতিবারে কেউ লেনদেন করত না। বৃহস্পতিবারের বারবেলাটাও সব কাজে অশুভ বলে মনে করত। শনিবারে, মঙ্গলবারে ও জন্মবারে কখনো নববস্ত্র পরিধান করত না। জন্মবারে বা জন্মমাসে কোন ক্ষৌরকর্ম বা কেশকর্তন করত না। মেয়েরাও ছেলের জন্মবারে বা জন্মমাসে নতুন কাপড় 'ভাঙত' না বা নতুন হাঁড়ি 'কাড়তো' না। রাত্রিকালে মেয়েরা চুল বাঁধত না, বা সিঁদুর পরত না, কিংবা আয়নায় মুখ দেখত না। বলত, সেরূপ করলে কুলটা হতে হবে। দাঁড়কাক ডাকলে, সেটা খুব অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। দোকানীরা রাত্রে সূঁচ বেচত না। রাত্রে কালপেঁচা ডাকলে, সেটাকেও অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। এছাড়া, বারবেলা, কালবেলা ইত্যাদিতে কোন শুভকর্ম করত না। একাদশীতে সধবা মেয়েদের মাছ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। বিশ্বাস করত যে একাদশীতে মাছ না খেলে সে বিধবা হবে। ওইদিন মেয়েরা পায়ে আলতা পরত। স্বামীর আগে মেয়েরা কখনো অন্নগ্রহণ করত না। স্বামী বা কোন গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। নামের প্রথম বর্ণটা পরিবর্তন করে তাদের নাম করত। কেউ এক চোখ দেখালে লোকে ভাবত অপরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। এর প্রতিকারার্থে তাকে দু'চোখ বন্ধ করে দেখাতে বলা হয়।

যেদিন সবাই হয়েছিল জুয়াড়ী

'সে আর এক কলকাতা'র লোক একবার জুয়ায় ডুবে গিয়েছিল। সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) দু-তিন বছর আগের কথা। জুয়াটার নাম 'তুলার খেলা'। একদিন দেখি, সব দোকানের সামনে ঝুলছে একখানা সাইনবোর্ড—মাপে এক হাত চওড়া ও দু হাত খাড়াই। বোর্ডটির মাথায় লেখা 'আমেরিকান কটন ফিগার'। আর তার নিচে দশটা লাইন, প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় লেখা আছে যথাক্রমে ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি—এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা।

আজ যদি কেউ কোন সংখ্যায় এক আনা পয়সা লাগায় আর সামনে কাল যদি সেই সংখ্যা ওঠে, তা হলে সে কাল আট আনা পয়সা পেত। পয়সা লাগাবার সময় ওরা একটা রসিদ দিত, আর কাল ওই রসিদটা দেখালেই ওরা আট আনা পয়সা দিয়ে দিত।

রাতারাতি কলকাতা শহরে গজিয়ে উঠেছিল হাজার হাজার 'তুলোর খেলার' দোকান। খেলাটা শহরের লোককে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে সারা শহরে জুয়ার বন্যা বয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাড়ির কর্তা খেলেন, গিন্নী খেলেন। বৌ খেলে, মেয়ে খেলে। ছেলে খেলে, জামাই খেলে। রাঁধুনী বামুন খেলে, ঝি-চাকর খেলে। মুটে খেলে, মজুর খেলে। দোকানদার খেলে, ব্যবসাপতি খেলে। এককথায় শহরের সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্তরের লোকই 'তুলোর খেলায়' মত্ত হয়ে উঠল। এমন কী স্কুলের ছেলেরাও মারবেল গুলি নিয়ে ওই খেলা খেলতে শুরু করে দিল।

তুলোর খেলায় যে নম্বরটা উঠত, সেটা আমেরিকার নিউ আরলীন্‌স শহরের তুলোর ফাটকা-বাজারের দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত। তুলোর খেলার যে বোর্ডগুলো দোকানের সামনে টাঙানো থাকত, তাতে এক থেকে দশ নম্বর ছাড়া আরো দু-তিনটি বহু-অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যা থাকত। সকলেরই ধান্ধা ছিল ওই সংখ্যাগুলি থেকে পরদিনের নম্বর আবিষ্কার করা।

আমার বাবার ডাক্তারখানায় বিকাল বেলায় তিন বৃদ্ধ মিলিত হতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন গোপালচন্দ্র দাস মশায়। তিনি বাংলা ভাষার অভিধান সংকলক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের জ্যাঠামশায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রায়ই তাঁর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেজন্য জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম। বোধ হয় গোপালবাবুই শহরের একমাত্র লোক যিনি তুলোর খেলা খেলতেন না। অপর দুজন ছিলেন সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়। জ্যোতিষী হিসাবে সিংগী মশায়ের বেশ নামডাক ছিল। তিনি একবার আমার হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, লেখা-পড়া আমার মোটেই হবে না, আমি ভবিষ্যতে ছুতোরের কাজে বিশেষ দক্ষ হব। সিংগী মশায় জ্যোতিষের সাহায্যে নম্বর বের

করে তুলোর খেলা খেলতেন। মাঝে মাঝে তিনি সফল হতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য হতেন।

মিত্তির মশায় আগে অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরি করতেন। তুলোর খেলার সময় তিনি অবসরপ্রাপ্ত বেকার। তিনি সারাদিন ধরে ওই বহুসংখ্যাবিশিষ্ট রাশিগুলি নিয়ে অঙ্ক কষতেন, আর পরের দিনের সংখ্যা বের করবার চেষ্টা করতেন। একদিন বিকাল বেলায় মিত্তির মশায় বেশ উৎফুল্ল হয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'ডাক্তার কেল্লা ফতে, শালা অমুকের বাচ্চারা আর কতদিন আমাদের ঠকাবে। অঙ্ক কষে নম্বরের সূত্র বের করে ফেলেছি। কালকের নম্বর হচ্ছে নয়।' আমার বাবা, সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়—এই তিন জনেই সেদিন ৯ নম্বরে এক টাকা করে লাগিয়ে দিলেন। সে-রাতটা আমার ঘুম হল না, পরদিনের জন্য খুব উৎসুক হয়ে রইলুম। পরদিন দেখি—'ভোঁ কাটটা।' উঠল ছয় নম্বর। নয় নম্বরের বদলে ছয় নম্বর ওঠায় তিন জনের টাকাই নয় ছয় হয়ে গেল।

এই রকমভাবে সমস্ত শহরের লোকই সেদিন কালকের নম্বর কী আসবে, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, অঙ্ক কষাকষি ও জ্যোতিষের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু কেউ কারুকে বলতে চাইত না সে সেদিন কোন্ নম্বরে বাজি লাগিয়েছে, পাছে আর কেউ সেটা জানতে পেরে লাভবান হয়। যার নম্বর উঠত, সে সেদিন বুক ফুলিয়ে হাঁটত। আর যার উঠত না, সে আবার বেপরোয়া হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' বলে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হত।

সেদিন আমাদের বাড়ির সংলগ্ন মল্লিকদের বাড়ির ঝি একথালা সন্দেশ এনে মার সামনে রাখল। বলল, 'মা পাঠিয়ে দিলেন।' তখনকার দিনে কোন সুসংবাদ থাকলে প্রতিবেশিরা পরস্পরের বাড়ি সন্দেশ পাঠিয়ে সংবাদটা দিতেন। (শব্দতাত্ত্বিকদের এটা গবেষণার বিষয় যে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'সংবাদ', এই প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে কি না)। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সংবাদ গো?' ঝি উত্তরে বলল, মা আজ বাজিমাৎ করেছেন কি না, তাই এই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।' মল্লিক বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালেই আমাদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যেত। কিছু পরেই পাঁচিলের ধারে মল্লিক গিন্নীর আবির্ভাব। উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকছেন, 'ও দিদি, ও দিদি, একটা সুসংবাদ শোন। পরশু রাত্তিরে স্বপ্নে দেখি যে মা-চণ্ডী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে বলছেন, কাল তুই পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগা।' তাই কাল পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগিয়েছিলুম। আজ চল্লিশ টাকা পেয়েছি।' তারপর এক গাল হেসে বললেন, 'বুঝেছ, কর্তার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি।' মা ক্লিষ্ট মনে কথাটা শুনলেন, কেননা মায়ের নম্বর ওঠেনি। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যারে, তুই তো গিন্নীমার নম্বর দোকানে লাগিয়ে আসিস, তা তুই পাঁচ নম্বরে কিছু লাগাস নি?' মল্লিক বাড়ির ঝি বলল, 'তা আর কী করে লাগাই বল মা, গিন্নী যে ছেলের দিব্যি দিয়ে দেয়। একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি, কী করে ওই দিব্যি অমান্যি করি বল।' বস্তুত, এই সময় মানুষের মনে স্বার্থপরতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেউ চাইত না যে, তার নম্বরের সাহায্যে অপরে লাভবান হয়। সকলের একই চিন্তা। কালকের নম্বর কী ভাবে আবিষ্কার করা যাবে। মল্লিক গিন্নীর

সাফল্যের কথা শুনে, আমাদের পাড়ার অনেকেই কালীঘাটে গিয়ে মানত করল, 'মা, আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দাও, আমি টাকায় এক আনা হারে তোমার পুজো দিয়ে যাব।' অনেকে আবার অন্যান্য কালীতলায় গিয়ে গণনা করাতে লাগল।

এইভাবে সারা শহরে প্রবাহিত হল জুয়ার বন্যা। লোক এক আনা লাগিয়ে আট আনা পেলে, আগেকার নষ্টধন উদ্ধারের জন্য, আট আনাই লাগিয়ে দিত পরের দিনের জন্য অন্য নম্বরে। সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা, অপরকে টেক্কা দেওয়া। এই টেক্কা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্রভাবে লোককে আক্রান্ত করল যে, লোকে দশ আনা পয়সা খরচ করে দুখানা রসিদ কাটাতে লাগল—একখানা জোড় সংখ্যার, আর একখানা বিজোড় সংখ্যার। নম্বর-এর আর পালাবার উপায় নেই। জোড় নম্বর উঠলে, লোক মাত্র জোড় নম্বরের রসিদখানা অপরকে দেখিয়ে গর্ববোধ করত। আর যদি বিজোড় নম্বর উঠত, তাহলে বিজোড় সংখ্যার রসিদ খানা দেখাত। আশ্চর্য হয়ে গিয়ে লোক পরস্পর বলাবলি করত, 'দেখ, অমুকের বরাত কী, রোজই বাজিমাৎ করছে।' প্রথম যারা এটা করত, তারা এটাকে গোপন রাখত। কিন্তু যখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল, তখন সকলেই ওই একই পন্থা অবলম্বন করল। ফলে, দশ আনা লাগিয়ে লোকে আট আনা পেতে লাগল। আজকের দিনের লোক বুঝতে পারবে না যে, সেদিন ওই দু আনা ক্ষতির পরিমাণ কত বড়। কেননা, তখনকার দিনে যে-কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনিক বাজার খরচ হত মোট চার আনা। সেদিনকার দিনে বাজারে পারশে, ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি, ভেটকি প্রভৃতি মাছের দর ছিল তিন আনা থেকে চার আনা সের, আর কাটা বড় রুই মাছের দর ছিল ছয় আনা সের। তিনটা বড় বড় বেগুন পাওয়া যেত এক পয়সায়, আলুর সের ছিল দু পয়সা থেকে চার পয়সা, আধ পয়সায় এক আঁটি নটে কিংবা কলমী শাক পাওয়া যেত, যার ওজন হবে আধ সেরের কাছাকাছি। মাংস ছয়-আনা সের ছিল, আর হাঁসের ডিমের দাম ছিল এক পয়সায় একটা।

সুতরাং শেষের দিকে যখন পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার জেদ মানুষকে গ্রাস করল, তখন বহুলোক ও পরিবার তুলোর খেলার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সংবাদপত্রে এই নিয়ে আন্দোলন হতে লাগল। খেলার সূচনা থেকে প্রায় আট দশ মাস উত্তীর্ণ হবার পর সরকার খেলাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু যারা সর্বস্বান্ত হল, তাদের প্রায় সবাই বাঙালী, আর যাদের সিন্দুকে বাঙালীর পয়সাটা গিয়ে পৌঁছল তারা মারবাড়ী।

খেলাটা উঠে যাবার পর আবার রাতারাতি পটপরিবর্তন হল। কেউ তুলোর খেলার দোকানকে রূপান্তরিত করল খাবারের দোকানে, কেউ ডাইংক্লিনিং-এর দোকানে, কেউ ছাতার দোকানে, কেউ ঘড়ির দোকানে, কেউ স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে, কেউ বা আবার চপ-কাটলেটের দোকানে।

শহরের বুকের ওপর প্রকাশ্যভাবে দিনের আলোয় এরূপ ব্যাপক জুয়ার স্রোত পূর্বে বা পরে আর কখনো হয়নি।

—

বইয়ের দুনিয়ার বঙ্গ'প্রসঙ্গ ব্লগ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক বইপত্রের সংগ্রহালয়। আমাদের উদ্দেশ্য আত্মঅনুসন্ধান ও তথ্য আদানপ্রদান। এর বাইরে আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। প্রকাশক বা লেখকের কোনও আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়। আমরা পিডিএফ কে কখনোই হার্ড কপির বিকল্প মনে করিনা। বইটি সর্বসাধারণের গোচরে এনে যদি পাঠকের লাভ হয় ও বইয়ের বিক্রি বাড়ে তবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল বলে ধরে নেব। তাই প্রত্যেক পাঠককে হার্ডকপি সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই।